আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণামুলক মল্যায়ন ও পর্যালোচনা

(31) اسلام اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: محمد صادق حسین

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন
অনূদিত

মুহম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণাকর্ম মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা
মূল : আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশনায় : মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
সেল : ০১৮২২-৮০৬১৬৩
০১৭২৮-৫৯৮৪৪০

মুদ্রণ : মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়াপল্টন, ঢাকা–১০০০

প্রচ্ছদ : সালসাবিল

ISBN : 978-984-91840-9-6

বিনিময় : ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র

U.S. # : 4.00 Only.

EVALUATION AND CRITICISM ON ISLAMIC RESEARCH WORK OF THE MUSLIMS WRITERS & ORIENTALISTS : Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Arabic and translated by Muhammad Sadik Hossain into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100; Bangladesh.

Call Phone : 01822-806163; Price : Tk. 120/- U$ 4.00 Only.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী দা'ঈ আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত *'আল ইসলামিয়াত: বাইনা কিতাবিল মুস্তাশরিকীন ওয়াল বাহিসীন আল মুসলিমীন'* পুস্তিকাটি মুসলিম দুনিয়ায় বিশেষত আরব দেশসমূহে বহুল পঠিত ও বেশ জনপ্রিয়। বিজ্ঞ লেখক এ পুস্তিকায় ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধ বিকাশে মুসলিম লেখকদের প্রয়াস ও অবদান এবং প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার স্বরূপ, মান, উদ্দেশ্য ও ভূমিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা (Comparative Study) পেশ করেন। প্রাজ্ঞ লেখক মুসলমানদের শেকড় সন্ধান, ঐতিহ্য অন্বেষণ ও ইতিহাস চর্চায় নিজেদের মূল উৎসে ফিরে যাওয়ার তাগিদ দেন। কতিপয় বিশিষ্ট লেখক-গবেষক ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বিকৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সচেতন পাঠকদের জন্য রেফরেন্স হিসেবে আল্লামা নদভী লিখিত পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এ বিবেচনাকে সামনে রেখে পুস্তিকাটি আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন। অনুদিত গ্রন্থের বাংলা শিরোনাম *'মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণাকর্ম: মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা'*। বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে এ গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' গৌরববোধ করছে। পাঠকদের অজানা নয় 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' এ পর্যন্ত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখিত সব গ্রন্থ পর্যায়ক্রমে বাংলায় ভাষান্তর করে মুদ্রণ ও প্রকাশনার এক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে ছোট বড় ২৫টি গ্রন্থ বাজারে এসেছে এবং আল্ হামদুলিল্লাহ বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মেহনত কবুল করুন, আমিন।

মুহাম্মদ আবদুর রউফ

'অনুবাদকের আরজ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

মানুষের জীবন অত্যন্ত ছোট। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশাল। বাজারে বা পাঠাগারে যত বই-পুস্তক রয়েছে, তা থেকে নির্বাচিত অংশও একজন পাঠক, লেখক বা গবেষক পড়ে কখনো শেষ করতে পারবে না। তাই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মন-মানস ও স্তরকে বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা ঠিক করে দেয়া হয় যাতে একজন ছাত্র অযথা সময় নষ্ট না করে তার বিষয় সংশ্লিষ্ট জরুরি বইগুলো অধ্যয়ন করে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে অথবা তার সীমিত সময়ের মধ্যে এমন কিছু বই সে পড়ে নিতে পারে যা তাকে হাজারো বই-পুস্তকের কাজ দেবে। নিশ্চয়ই এমন বই নির্ধারণ করা খুবই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। তবে কোনো দরদী গবেষক মুসলিম উম্মাহর একজন মুখলেস অভিভাবকের ন্যায় তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে হাজারো বইয়ের নির্যাস যদি তুলে ধরে একটি বইয়ের মধ্যেই তাহলে কতই না চমৎকার হয়! সেই চমৎকার কাজটিই করেছেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মণীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) তাঁর 'মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলামবিষয়ক গবেষণাকর্ম: মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা' শীর্ষক বইয়ে। আরবি ভাষায় লিখিত মূল বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে 'আল ইসলামিয়াত: বাইনা কিতাবাতিল মুস্তাশরিকীন ওয়াল বাহিসীন আল মুসলিমীন'। বইটি আধুনিক প্রজন্ম বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষক ও আলেম সমাজের জন্য নির্বাচিত বইয়ের শীর্ষে থাকার উপযুক্ত। যারা দাওয়াত, লেখালেখি ও গবেষণাকর্মে রত আছেন তাদের জন্য এই বইটি কর্মনির্দেশক হিসেবে কাজ দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবার পরিশ্রম কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন
১৩ রমযান ১৪৩৫ হি.
১২ জুলাই ২০১৪ ইং

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	০৩
অনুবাদকের আরজ	০৪
মুখবন্ধ ('ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ' বিষয়ক গবেষণা সেমিনার)	০৭
ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা	১৩
প্রাচ্যবিদদের কিছু কিছু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা অনস্বীকার্য	১৪
অনেক প্রাচ্যবিদদের লেখায় দুর্বলতা অনুসন্ধান ও ছিদ্রান্বেষনের প্রবণতা	১৫
প্রাচ্যবিদদের সূক্ষ্ম কৌশল	১৭
প্রাচ্যবিদদের বই-পুস্তকের উপর প্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানীমহলের নির্ভরতা	১৯
লেখা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত জরুরি	২০
প্রাচ্যবিদদের লেখা ইলমি বই-পুস্তকগুলো যাচাই-বাছাই করতে হবে	২০
গঠনমূলক ও ইতিবাচক এক কর্মযজ্ঞ নিতান্ত প্রয়োজন	২১
বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সম্পাদিত ইসলামী গবেষণাকর্ম : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	২৩
আক্রান্ত দেশসমূহে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় জ্ঞানভিত্তিক গবেষণাকর্মের স্বল্পতা	২৫
আক্রান্ত অন্যান্য অঞ্চলের মাঝে ভারতের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য	২৬
খ্রিস্টবাদের জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা প্রসঙ্গে	২৭
একটি পূর্ণাঙ্গ শতাব্দীর ফসল	৩০
চমৎকার ইংরেজি ভাষায় রচিত ভারতীয় মুসলিম লেখকদের কতিপয় গ্রন্থ	৩১
দাওয়াত ও রচনার ক্ষেত্রে আহমদিয়া জামাতের কর্মকান্ড	৩৪
সমসাময়িক গ্রন্থরচয়িতা	৩৬
'হেদায়েতপ্রাপ্ত' লেখকদের কতিপয় শক্তিশালী গ্রন্থ	৩৭
ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা একাডেমি: পরিচয় ও ফসল	৩৯

উর্দূভাষায় রচিত বৃহদাকারের ইলমি গবেষণাকর্ম ৪২
আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ), আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহঃ) এবং 'দারুল মুসান্নিফীন' ৪৩
দিল্লীস্থ নদওয়াতুল মুসান্নিফীন ৪৯
অন্যান্য লেখক ও গবেষক ৫০
পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষা ৫২
জ্ঞান-গবেষণা ও গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন মাদরাসা শিক্ষিতদের শ্রেষ্ঠত্ব... ৫২
যেসব ব্যক্তি একেকটি গবেষণা একাডেমির ভূমিকা পালন করেছে......... ৫৪
হায়দ্রাবাদস্থ দায়েরাতুল মা'আরেফ আল উসমানিয়াহ........................ ৫৯
আরব বিশ্বে আরবি ভাষায় রচনা ও সম্পাদনাকর্ম ৬০
গভীর ও তুলনামূলক ইসলামী শিক্ষা ৬৫
দাওয়াতের লেখক ও ইসলামী চিন্তার আহ্বায়ক........................ ৬৬
আরব উপদ্বীপে সম্পাদনা ও গবেষণাকর্ম........................ ৬৭
বিশ্ববিদ্যালয় মানের সন্দর্ভ ও পিএইচডি গবেষণাকর্মসমূহ................ ৬৮
ইরান ও তুরস্কে ৭০
ইসলামী আরব মরক্কোতে........................ ৭০
আজকের জিহাদ ও অপরিহার্য দায়িত্ব........................ ৭১

মুখবন্ধ

'ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ' বিষয়ক গবেষণা সেমিনার
(যে উপলক্ষ্যে বক্ষমান গবেষণাকর্মটি রচিত)

ভারতের আজমগড়স্থ 'দারুল মুসান্নিফীন' একাডেমির দায়িত্বশীল পরিচালকবৃন্দ- যাদের অগ্রভাগে ছিলেন এই গবেষণা একাডেমির মহাসচিব জনাব সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান- দীর্ঘ দিন ধরে এমন একটি সেমিনার আয়োজনের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন যাতে বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে লিখিত প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকর্মসমূহ পর্যালোচনা করা হবে। এতে করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ক্ষেত্রে তাদের ইলমি প্রচেষ্টাসমূহের একটি পর্যালোচনা যেমন হবে, তাদের গবেষণাকর্মগুলোর একটি মূল্যায়নও করা হবে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি গবেষণামূলক সেমিনারের আয়োজন ছিল দীর্ঘ দিনের দাবি।

অবশেষে একাডেমি তার উপর্যুক্ত সেমিনার আয়োজনের ইচ্ছাটি পূরণ করতে সক্ষম হয় মহান আল্লাহর একান্ত রহমতে। তা ছিল– ২৬–২৮ রবিউস সানি ১৪০২ হি. মোতাবেক ২১–২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ইং রোজ রবি থেকে মঙ্গলবার।

গবেষণা সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় আজমগড় শহরে অবস্থিত দারুল মুসান্নিফীনের প্রধান ভবনের সাথে লাগানো আল্লামা 'শিবলি ন্যাশনাল পোস্ট গ্রেজুয়েট কলেজ' প্রাঙ্গণ ও সম্মেলন হলে। সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশন ও আমন্ত্রিত মেহমানদের আবাসনের জন্য বেশ কিছু ছাউনি ও ক্যাম্প তৈরি করা হয়। কারণ, ওই শহরে সুবিধাজনক কোনো হোটেল-মোটেল গড়ে উঠেনি তখনো।

আলোচ্য সেমিনার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামা বিশেষ করে নদওয়ার আরবি ভাষা অনুষদ ছিল দারুল মুসান্নিফীনের সহযোগী। ফলে, নদওয়া থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একটি দল প্রতিনিধিত্ব করে সেখানে। তারা বিষয়টিকে একান্তভাবে আপন করে নেন এবং সেমিনারের যাবতীয় আয়োজন ও পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ভারতের অন্যান্য ইসলামী ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও ব্যাপক

প্রতিনিধিত্ব ছিল সেমিনারে। বিদেশের যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাদের মধ্যে মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দাহরানস্থ খনিজ ও পেট্রোল বিশ্ববিদ্যালয়, দোহায় অবস্থিত কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, আল আইন শহরে অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কাস্থ রাবেতা আল আলম আল ইসলামী, আবুধাবির শরয়ী বিচারের প্রধান কার্যালয়,[১] পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার, করাচিস্থ হামদর্দ ফাউন্ডেশন, থাইল্যান্ডের ব্যাংককস্থ জমিয়তুল ইসলাম, জাপানের জমিয়তুল ইসলাম, দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্যতম। এছাড়া, ভারতীয় বিভিন্ন সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ও বিশেষজ্ঞ দলও ছিল।

উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৬ রবিউস সানি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি রোববার সকাল দশটায় প্রধান ছাউনিতে। এ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা হয় কাতার বিশ্ববিদ্যালয়স্থ শরিয়া ও ইসলামী স্টাডিজ অনুষদের ডীন প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক ডঃ ইউসুফ কারযাভিকে। পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন আরম্ভ করা হয়। তেলাওয়াত করেন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় অধ্যয়নরত জনৈক ইন্দোনেশীয় ছাত্র। অত:পর দারুল মুসান্নিফীন একাডেমির মহাসচিব জনাব সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্যও ছিল ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ বিষয়ক গবেষণা প্রসঙ্গে। তারপর বিভিন্ন প্রতিনিধি দল ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্যাংককস্থ জমিয়তুল ইসলামের প্রতিনিধি জনাব ইবরাহীম কুরায়শি, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব সৈয়দ হামেদ, পাকিস্তান হামদর্দ ফাউন্ডেশনের প্রধান জনাব হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ, দাহরানস্থ খনিজ ও পেট্রোল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ডঃ যফর ইসহাক আনসারি, ডারবান বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিনিধি ডঃ

---

১. দুবাই ও শারজা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি আরবের আরো অনেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অতিথিরা এসেছিলেন। তারা দিল্লী পর্যন্ত পৌছেন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার নানা ধরনের সমস্যার কারণে তারা নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠানস্থলে পৌছুতে পারেননি। কেননা, আজমগড় পর্যন্ত তখনো আকাশ পথে যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ শহরের সাথে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল রেলপথ।

সৈয়দ সালমান নদভী[১], আল্লামা শিবলি কলেজের প্রাক্তন ডীন জনাব শওকত সুলতান। তাদের প্রত্যেকেই সেমিনারের আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে এমন একটি গবেষণা সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রে দারুল মুসান্নিফীনের অগ্রগামী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। যেসব বিষয় ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে, সেসব বিষয়য়াদি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে দারুল মুসান্নিফীন কর্তৃক গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করেন সবাই। এরপর যেসব চিঠিপত্র এ উপলক্ষ্যে দারুল মুসান্নিফীনের নিকট পৌঁছেছে, তার মধ্য থেকে তিনটি পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। এগুলো ছিল রিয়াদ থেকে আগত ডঃ মুহাম্মদ মারূফ দাওয়ালীবির পত্র, আবুধাবির শরয়ী আদালতের প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ ইবন আবদুল আজিজ আলে মুবারকের পত্র যার বাহক ও উপস্থাপক ছিলেন আবুধাবির শরয়ী বিচারের প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা উপদেষ্টা এবং আল আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তকিউদ্দীন নদভী। আরেকটি ছিল মরক্কোস্থ ফাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্য বিভাগের সভাপতি ডঃ আবদুস সালাম আল হারাসের। অত:পর দারুল মুসান্নিফীনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণ একদিকে আগত প্রতিনিধিগণের জন্য স্বাগত ভাষণ যেমন ছিল, তেমনি ছিল সেমিনারের উদ্বোধনী প্রবন্ধস্বরূপ। কারণ, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত পরিমাণের তথ্যসম্বৃদ্ধ ছিল। সায়্যিদ সালমান হুসাইনি নদভী তাঁর সেই গবেষণা প্রবন্ধ থেকে– যা তিনি আলোচ্য সেমিনারের উদ্দেশ্যে আরবি ভাষায় তৈরি করেছিলেন- নির্বাচিত কিছু অংশ পাঠ করেন। কারণ, পুরোটা পাঠ করার জন্য সময় ছিল না। সেই প্রবন্ধটিই সম্মানিত পাঠকমহলের সামনে পেশ করা হচ্ছে এ পুস্তকে। তারপর অধিবেশনের সভাপতি ডঃ ইউসূফ কারদাভি তার বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারের প্রবন্ধগুলোকে বিন্যস্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। একই সাথে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয় যারা বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং প্রদত্ত বক্তব্যগুলোর সুচিন্তিত পর্যালোচনা করবেন এবং সেই আলোকে সেমিনারের সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। সর্বমোট পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আগত প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ। তবে তার

১. তিনি 'দারুল মুসান্নিফীন'এর সাবেক প্রধান আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর সাহেবজাদা।

মধ্য থেকে বিভিন্ন অধিবেশনে তেইশটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পাঠ করা হয় এবং সেগুলো নিয়েই অধিবেশনে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। এর চেয়ে বেশি প্রবন্ধ পড়ার জন্য সময় যথেষ্ট ছিল না।[১] ডঃ সৈয়দ সালমান নদভী ও সৈয়দ সালমান হুসাইনী নদভী উভয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এ সেমিনারে। প্রথম জনের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন অধিবেশন সঞ্চালন করা আর দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রবন্ধগুলোকে আরবি ও উর্দু ভাষায় রূপান্তর করা এবং তার সংক্ষিপ্তসার পেশ করা।

সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ রবিউস সানি ১৪০২ হিঃ মোতাবেক ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ইং মঙ্গলবার জোহরের সময়। এতে সেসব সুপারিশ পেশ করা হয়, যা সেমিনারের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনা-পর্যালোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি সংগ্রহ করেছিল। আলোচ্য সেমিনার হতে ইস্যুকৃত সুপারিশ মতে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডকে চালু রাখার লক্ষ্যে একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাথে সাথে এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত অফিসটি হবে আজমগড়স্থ 'দারুল মুসান্নিফীন'-এ।

পাঠকমহলের বরাবরে সেই সমৃদ্ধ মূল্যবান প্রবন্ধটি পেশ করা হচ্ছে– যা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (নদওয়াতুল উলামার মহাসচিব এবং দারুল মুসান্নিফীনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান) 'ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ' বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেছিলেন।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে।

মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী
সেক্রেটারি, ইসলামী গবেষণা একাডেমি
নদওয়াতুল উলামা, লাক্ষ্ণৌ।

পহেলা জুমাদিউস সানি ১৪০২ হিঃ
২৭ মার্চ ১৯৮২ খ্রী.

---

১. এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করা হবে।

মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের
ইসলামবিষয়ক গবেষণাকর্ম
মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

প্রাচ্যবিদদের লেখালেখি ও গবেষণাসমূহের জ্ঞানগর্ভ মূল্যায়ন,
মুসলিম বিশ্বে সম্পাদিত বিশ্বকোষ মানের গবেষণাকর্ম
এবং বিদেশি ভাষায় রচিত দাওয়াহ সাহিত্যের
উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা :

যারা লেখালেখি করেন, বই-পুস্তক সম্পাদনা করেন, গবেষণা করেন এবং যারা জানেন, একটি সুন্দর বই রচনা করতে অথবা দীর্ঘ গবেষণা করে একটি সঠিক ফলাফলে পৌঁছুতে একজন লেখক বা গবেষককে কী পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়, কী পরিমাণ শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে হয়– তাদের জন্যে জ্ঞানের চর্চায় নিয়োজিত আরেকটি গোষ্ঠী কিংবা জামাতের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ও কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়া বড়ই জটিল বিষয়। যারা গবেষণা ও জ্ঞানের মূল্য বোঝেন তারা গবেষণাধর্মী কাজে লিপ্ত অন্য একটি দলের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন না, পাইকারিভাবে তাদের ভাল ও সুন্দর দিকগুলোকে অস্বীকার করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে সবাইকে এক পাল্লায় পরিমাপ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আমরা জানি, প্রাচীন কি আধুনিক, সর্বযুগে যারা প্রকৃত গবেষক ও জ্ঞানী তারা অন্যান্য পেশা ও শিল্পে নিয়োজিত লোকদের চাইতে তুলনামূলকভাবে বেশি উদার ও প্রশস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে থাকেন। অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যের ঋণস্বীকারের ক্ষেত্রে জ্ঞানীরা সবসময় এগিয়ে। পূর্বসূরীদের পাশাপাশি সমসাময়িক লোকদের জ্ঞানভিত্তিক পরিশ্রম থেকেও তারা অনায়াসে উপকৃত হতে চান। এমনকি গবেষণা ও লেখালেখিতে নিজেদের চাইতে কম অভিজ্ঞ ও কম বয়েসী লোকের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতেও তারা দ্বিধাবোধ করেন না। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোরতা ও অকৃতজ্ঞতা অন্য কোনো কিছুর চেয়ে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথেই সবচেয়ে বেশি সাংঘর্ষিক। অপরের অনুগ্রহ স্বীকার না করা কিংবা সত্যকে অস্বীকার করার মানসিকতা ইসলামের শিষ্টাচারের সাথে সর্বৈব বিপরীত। পবিত্র কুরআন বলছে :

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।'[১]

---

১. সূরা আন-নিসা : ৫৮

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী।' [১]

'তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।' [২]

সুতরাং, যদি জ্ঞানভিত্তিক কোনো কাজের, কোনো গবেষকের গবেষণাকর্মের সমালোচনা করতেই হয় অথবা কারো গবেষণার সাথে যদি মতানৈক্য থাকে, তার মতকে খন্ডন করতেই হয় অথবা তার ভুল ধরিয়ে দেবার দরকার হয়, অবশ্যই তা হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত ও জ্ঞানভিত্তিক। সমালোচনা হতে হবে পরিচ্ছন্ন এবং তাতে যুক্তি ও ন্যায়ের মানদন্ড কোনভাবেই ভূলুণ্ঠিত করা যাবে না। ফিকাহ্‌বিদগণ সত্যই বলেছেন– 'প্রয়োজনকে প্রয়োজনের মানদন্ডেই পরিমাপ করতে হবে।'

প্রাচ্যবিদদের কিছু কিছু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা অনস্বীকার্য :

তাই আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, কিছু সংখ্যক প্রাচ্যবিদ নিজেদের জীবন ও শক্তিকে ইসলামী জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত করেছেন। কোনো ধরণের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রণোদনা ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ ও সুরুচির বশবর্তী হয়েই তারা প্রাচ্য ও ইসলামী বিষয়াবলীকে গবেষণার জন্যে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা এমন প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছেন যার প্রশংসা করতে আমাদের ভাষা ও রসনা বাধ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিরল ও দুর্লভ বিষয় যা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আলোর মুখ দেখেনি, প্রাচ্যবিদদের নিরলস পরিশ্রমের বদৌলতেই তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে পাঠকসমাজে। একই সাথে তা ঘুণপোকা ও অজ্ঞ উত্তরসুরীর হাত থেকে চিরদিনের জন্যে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক মুল্যবান উৎস, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য প্রথমবারের মত সবার সামনে এসেছে একমাত্র প্রাচ্যবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহসের কল্যাণে, যা দেখে খোদ প্রাচ্যের জ্ঞানীদের চক্ষু শীতল হয়ে যায়।

---

১. সূরা আল-মায়েদাহ : ৮

২. সূরা আর-রহমান : ৯

এক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের সবার নাম তো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে উদাহরণস্বরূপ এখানে তাদের কয়েকজনের নাম সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেমন: মূল্যবান গ্রন্থ 'ইসলামের দাওয়াত' (The Preaching of Islam) এর রচয়িতা প্রফেসর টি ডব্লিউ আর্নোল্ড (T. W. Arnold), 'সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী' (Saladin) ও 'স্পেনে আরবজাতির ইতিবৃত্ত' (Moors in Spain) শীর্ষক বইদ্বয়ের লেখক স্ট্যানলি লেনপোল (Stanley Lane-Poole), বিখ্যাত লেখক আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বিরচিত 'আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা' এর উপর মূল্যবান ইংরেজি ভূমিকা লেখক ডঃ এলোয়েস স্প্রেঞ্জার (Dr. Aloys Sprenger)। ভূমিকাটি কলকাতাস্থ তৎকালীন রয়েল এশিয়েটিক কম্প্লেক্স কর্তৃক মুদ্রিত।

তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন– বৃহদাকারের প্রসিদ্ধ আরবি-ইংরেজি অভিধান (Arabic-English Lexicon) প্রণেতা এডওয়ার্ড ওলিয়াম লেন (Edward William Lane)। তিনি আরবি বিষয়াদিকে ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য করে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এ অভিধানে। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের অনেক আলেম-ওলামা, অনেক জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ এ অভিধান দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন। তার মৃত্যুর পর অভিধানের নয় খন্ড থেকে তিনখন্ড মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছেন বিখ্যাত 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস আল আমুত তাফসীলী' প্রণেতা এ, জে, উইনসিক (A. J. Wensinck)।

এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে মূলত: চৌদ্দজন ইমামের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলনসহ সীরাত ও মাগাযি বিষয়ক বিভিন্ন বইয়ে সংকলিত হাদীস শরীফের নির্ঘন্ট হিসেবে[১]। বিরাট আকারের এ গ্রন্থটিকে লেখক হাদীসে বর্ণিত শব্দের অর্থ, ইলমি মাসআলা ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির পরিচিতি ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন এবং সেসব বিষয়গুলোকে সাজিয়েছেন অভিধানের বর্ণানুক্রমে। গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটিকে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন জনাব ফুয়াদ আবদুল বাকি। নাম দিয়েছেন 'মিফতাহু কুনূযিস সুন্নাহ'। এর ভূমিকা লিখেছেন আল্লামা সাইয়িদ রশীদ রেযা ও আল্লামা আহমদ মুহাম্মদ শাকের।

এছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীসবিষয়ক অভিধান 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস লিআল ফাজিল হাদীসিল নববী' এর নির্দেশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর

১. এ সব ইমামের নাম, তাদের বইয়ের নাম এবং গ্রন্থটি সংকলনের ক্ষেত্রে লেখকের বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্যে গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উইনসিক[১]। আলোচিত এ অভিধানটি সংকলন করেছেন একদল প্রাচ্যবিদ এবং তা ১৯৩৬ ইং সালে প্রকাশিত হয়। পাঠক খুব সহজেই এ অভিধান থেকে উপকৃত হতে পারে। বড় বড় সাত খন্ডে মুদ্রিত অভিধানটি এখন সর্বত্র পাওয়া যায়।

তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন 'প্রাচ্য খেলাফতের ভূমি' (Lands of The Eastern Caliphate) শীর্ষক বইয়ের লেখক জি, বি, স্ট্রেঞ্জ (G. B. Strenge)।

উপরোক্ত এসব গ্রন্থ, সংকলন ও গবেষণার আকার ও ধরণ থেকেই প্রমাণিত হয়, এর লেখক ও সংকলকদের কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে এর পেছনে![২]। একই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের পড়ালেখা ছিল সমৃদ্ধ ও একনিষ্ঠ। সত্যকে এড়িয়ে চলা এবং বিশেষ ধর্মপ্রীতি থেকে অনেকটা বিমুক্ত হয়েই তারা এসব মহান কর্ম সম্পাদন করেছেন বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

অনেক প্রাচ্যবিদদের লেখায় দুর্বলতা তালাশ ও ছিদ্রান্বেষনের প্রবণতা :

প্রাচ্যবিদদের অবদান ও জ্ঞানের বিষয়ে উপরোল্লিখিত স্বীকৃতি সত্ত্বেও ভাবগম্ভীর এই ইলমি আসরে আমাকে একটি বিষয় খোলাসা করে বলতে হয় যে, প্রাচ্যবিদদের একটি বিরাট অংশের প্রাণান্তকর প্রয়াস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে তা খুঁজে বের করা এবং তা নিছক রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে, তাদের উদাহরণ অনেকটা সেই ব্যক্তির মত যে সুন্দর, সবুজ-শ্যামল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল একটি শহরে এসে শুধুই খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোথায় নালা-নর্দমা, শৌচাগার ও দুর্গন্ধ ডোবা আছে। ঠিক সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ময়লা পানি ও আবর্জনা দেখা-শোনার দায়িত্বে নিযুক্ত ড্রেন ইন্সপেক্টর (Drain Inspector)-এর মতই। স্বভাবতই ড্রেন ইন্সপেক্টর তার দায়িত্ব পালন শেষে যে রিপোর্টটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন, তাতে পাঠক স্বাভাবিকভাবেই ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধময় বস্তুর বিবরণ বৈ কিছুই দেখতে পায় না।

---

১. এ অভিধানটি প্রণীত হয়েছে সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদে দারিমী, মুআত্তা ইমামে মালেক ও মুসনাদে ইমামে আহমদ ইবনে হাম্বল এ বর্ণিত শব্দসম্ভার নিয়ে।

২. এখানে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত প্রাচ্যবিদদের সেসব বই-পুস্তকের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে যা সাধারণতঃ ইসলাম ও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কটুক্তি এবং সত্যবিকৃতির দোষ থেকে থেকে মুক্ত। এছাড়া, সরাসরি ভাষাজ্ঞান না থাকায় ফরাসী, জার্মান ও হল্যান্ড ইত্যাদি ভাষায় লিখিত প্রাচ্যবিষয়ক বই-পুস্তকসমূহ এ আলোচনায় আনা হয়নি।

আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের সকল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম নিয়োগ করে থাকেন ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সমাজ ও তাহযিব-তমদ্দুনের মধ্যে দুর্বল দিকগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরার পেছনে। এমনকি ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরীয়তের কোথায় কোথায় দুর্বলতা রয়েছে, তা খুঁজে পাঠকের সামনে ভয়াবহ রূপে উপস্থাপন করাই যেন তাদের একান্ত সাধনা। এসব দুর্বলতাকে তারা দূরবীক্ষণযন্ত্র (Microscope) এর সাহায্যে দেখেন এবং সেভাবেই তা তারা পাঠকমহলে সামনে পেশ করে থাকেন, যাতে পাঠক অণুকে পাহাড়ের আকারে দেখতে পায় আর ফোটাকে দেখতে পায় বিশাল সাগরসদৃশ। ইসলামের চিত্রকে বিকৃত করে লেখা অনেক বই-পুস্তকে তাদের সেই কুটিল মেধা ও পান্ডিত্য চোখের পড়ার মত। এর মাধ্যমে তারা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নেতা ও পরিচালকের মধ্যে যারা পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা কালচারাল সেন্টারগুলোতে বেড়ে উঠেছেন অথবা যারা ইসলামকে অধ্যয়ন করেছেন পাশ্চাত্যের ভাষায়, তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে এবং ইসলামী উৎসগুলো সম্পর্কে সংশয়ের জন্ম দেয়, তাদের মনে-প্রাণে সৃষ্টি করে ইসলামের অতীত নিয়ে চরম বিভ্রান্তি, ইসলামের বর্তমান অবস্থার উপর প্রচন্ড ক্ষোভ এবং ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে চরম হতাশা। ফলে, এসব নেতা একসময় 'দ্বীনের সংস্কার করতে হবে', 'ধর্মকে উন্নত করতে হবে' ইত্যাদির মত জঘন্য শ্লোগান তোলে। তাদের সমস্ত তৎপরতা ও উচ্ছলতা নিয়োজিত করেন 'ইসলামী আইনের সংস্কার' করার পেছনে।

প্রাচ্যবিদদের সূক্ষ্ম কৌশল :

অনেক প্রাচ্যবিদের কর্মকৌশল হচ্ছে, তারা প্রথমে নিজেদের স্বার্থে একটি লক্ষ্য স্থির করেন। অত:পর যে কোনো উপায়ে তারা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর নেমে পড়েন তার সপক্ষে ধর্ম ও ইতিহাসের বই-পুস্তক থেকে ভাল-মন্দ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে, অথবা সাহিত্য ও কবিতা বা উপন্যাস ও গল্প-কাহিনীর বই থেকে কিংবা অশ্লীল ও রম্য কোনো বই-পুস্তক থেকে। এমনও উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন যার সাথে উদ্দিষ্ট বিষয়ের কোনোই সম্পর্ক নেই। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যতই নিম্নমানের ও মূল্যহীন হোক, তা তারা সাজিয়ে নিতান্ত সাহসিকতার সাথে পেশ করেন এবং সেই সাজানো তথ্য-উপাত্তসমূহকে কেন্দ্র করে এমন একটি মতবাদ দাঁড় করান, তাদের মনে ও কল্পনা ব্যতীত যার কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই।

প্রায় সময় দেখা যায়, তারা কোনো একটি দোষ মানুষের অন্তরে প্রোথিত করার জন্যে কৌশলস্বরূপ এমন দশটি ভাল দিক বর্ণনা করেন, বাস্তবে যেগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই। আর এটা করে এ জন্যেই যে, যাতে পাঠক ওই লেখকের মানসিক উদারতা ও হৃদয়ের বিশালতার সামনে প্রভাবিত হয়ে যায়। দশটি ভাল দিক উল্লেখ করার পর এমন একটি দোষ বর্ণনা করেন, যা সংশ্লিষ্ট সকল ভাল দিকগুলোকে এক নিমিষেই মিটিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কখনো কখনো তারা কোনো দাওয়াত অথবা কোনো ব্যক্তিত্বের পরিবেশ ও এতদসংক্রান্ত ইতিহাস এবং সেই দাওয়াত ও ব্যক্তিত্বের প্রাকৃতিক কারণগুলোকে অত্যন্ত পাণ্ডিত্য ও ভাষা অলংকারে সাজিয়ে চিত্রায়িত করেন। এমনভাবে চিত্রায়িত করেন যে, এই দাওয়াত ও ব্যক্তিত্ব যেন সেই পরিবেশ অথবা সেই প্রাকৃতিক কারণসমূহেরই দান, তারই প্রতিফলন হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনেকটা সেই বিস্ফোরণম্মুখ আগ্নেয়গিরির মত যা শুধু অপেক্ষা ছিল একটি সামান্য স্ফুলিঙ্গের। অতএব, এই ব্যক্তিত্বটি সেই কাঙ্খিত স্ফুলিঙ্গটির সংযোগ দিতেই হয়ে গেল বিস্ফোরণ। ফলে সাধারণ পাঠক এখানে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে চায় না, এখানে অপার্থিব কোনো উৎসের সংযোগ ছিল। আলোচ্য এ ব্যক্তিত্ব বা দাওয়াতের কোনো মাহাত্ম্যের কথা মানতে রাজি নয়। কোনো মতেই স্বীকার করতে চায় না, এসবের পিছনে কোনো ঐশী সমর্থন কিংবা কোনো অদৃশ্য ইচ্ছা ছিল।[১]

অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের লেখায় নির্দিষ্ট পরিমাণে 'বিষ' প্রয়োগ করেন। অত:পর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হয়। নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে তথ্যবিষ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন, পাছে পাঠক না আবার সতর্ক হয়ে যায়। এতে সে নিংসঙ্গতা অনুভব করতে পারে এবং লেখকের পবিত্রতা নিয়ে তার যে আস্থা তাতে ভাটা পড়তে পারে– এ আশংকায় তারা তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি মিথ্যা ও বানোয়াট মিশান না। এদের লেখা পাঠকের জন্যে ওইসব লেখকের চাইতে বেশি ভয়ংকর যারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করে। অথচ এসব লেখক তাদের লেখা বই-পুস্তক গোপনে গোপনে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যে পরিপূর্ণ করে তোলে, যা মধ্যম মানের পাঠকের পক্ষে ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, পাঠক যখন সেই দূষিত বই-পুস্তক সমাপ্ত করে, তখন লেখকের সেই মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়ে যায়।

---

১. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তপূর্ববর্তী আরব উপদ্বীপ ও জাহেলী যুগের বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের রীতি ছিল এরকমই।

প্রাচ্যবিদদের বই-পুস্তকের উপর প্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানী মহলের নির্ভরতাঃ

আরব ও মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানগত দুর্বলতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্বল্পতার অন্যতম একটি প্রমাণ হচ্ছে, একান্ত ইসলামী বিষয়গুলোর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তারা প্রাচ্যবিদদের লেখা বই-পুস্তকসমূহের উপরই নির্ভর করে থাকে। দীর্ঘ যুগ থেকে এ বিষয়ে তাদের লেখা বই-পুস্তকই একেবারে 'পবিত্র গ্রন্থ' (Gospel) এর স্থান দখল করে আছে। যেমন, আরবি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে আর. এ. নিকলসন (R. A. Nicholson) লিখিত বই 'আরবদের সাহিত্য ইতিহাস' (A Literary History of Arabs), ইসলাম ও আরবদের ইতিহাস বিষয়ে ড. পি কে হিট্টি (Dr. P. K. Hitti) রচিত বই 'আরবদের ইতিহাস' (History of Arabs), আরব সাহিত্যসমূহের ইতিবৃত্ত বিষয়ে জার্মান ভাষায় লেখা কার্ল ব্রোক্লেম্যান (Carl Brocklemann) এর বই (Arabichen Literature)। শেষোক্ত বইটি পরে ইংরেজি ভাষায়ও অনুবাদ করা হয় 'আরব সাহিত্যের ইতিহাস' (The History of Arab Literature) শিরোনামে।

একইভাবে ইসলামের শরিয়াহ ও আক্বীদা বিষয়ে গোল্ডযিহার (Goldziher) প্রণীত বই 'ইন্ট্রোডাক্‌শন টু ইসলামিক থিওলজী এ্যান্ড ল' (Introduction to Islamic Theology and Law) এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে লেখা (Muhammedanische Studien Halle), ইসলামী ফিক্বহের উৎস সম্পর্কে লেখা শাখ্‌ত (Schacht) এর বই 'দ্যা অরিজিন অব মোহাম্মাডানস জুরিসপ্রুডেন্স' (The Origins of Mohammadans Jurisprudence), সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলন ও ভাবধারা নিয়ে রচিত ডব্লিউ সি স্মিথ (W. C. Smith) এর 'ইসলাম ইন মডার্ণ হিস্ট্রি' (Islam In Modern History), এ আর গিব (A. R. Gibb) বিরচিত 'ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি' (Whither Islam), মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনচরিত নিয়ে রচিত মন্টগোমারী ওয়াট (Muntgomery Watt) এর 'মুহাম্মদ (সা.) এর মক্কী জীবন' (Muhammad In Mecca), 'মুহাম্মদ (সা.) এর মাদানী জীবন' (Mohammad In Madina) ও 'একজন নবী ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)' (Muhammad, Prophet and Statesman) ইত্যাদি।

তাদের ধারণায় এসব বই-পুস্তক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অদ্বিতীয় এবং প্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবস্থিত আরবি ও ইসলামী বিভাগের জন্যে তা জ্ঞানের এক অনন্য গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সোর্স হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ অঞ্চলের

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের (Islamic Studies Department) অধীনে গবেষণারত লেখকদের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে এসব বই।

প্রাচ্যবিদ কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামী বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia of Islam) (যার মধ্যে কিছু মুসলিম গবেষকদের সামান্য অবদানও রয়েছে) এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের হয়ে গেছে। সেটাই এখন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় উৎস ও জ্ঞান-ভান্ডার হিসেবে গণ্য করা হয়। আজকাল কোনো কোনো মুসলিম দেশতো প্রাচ্যবিদদের লেখা ওই 'বিশ্বকোষ'টাকে ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির হুবহু অনুবাদের ব্যবস্থাও করেছে তারা। এখান থেকে আশা করা যায়, ইসলামী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মুসলিম গবেষকদের কলমে নিরেট ইসলামী বিশ্বকোষও রচিত হবে ইনশাআল্লাহ।[১]

লেখা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত জরুরি :

প্রাচ্যবিদদের নেতিবাচক প্রভাব রোধ করার জন্যে এবং সৃষ্ট অনিষ্টের সংশোধনের জন্যে ইসলামের আলেমসমাজ, গবেষক ও চিন্তাবিদদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অবশ্যই কলম ধরতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সামনে সুনির্দিষ্ট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে। সাথে সাথে সেই প্রশংসিত দিকগুলোর প্রতি যথাযথ যত্নবান থাকতে হবে– যা প্রাচ্যবিদদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; বরং তাদের থেকে একটু এগিয়ে থাকতে হবে এ ক্ষেত্রে। একইভাবে মৌলিক গবেষণা, বিস্তর অধ্যয়ন, গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, নিশ্চিত ও সঠিক সোর্স এবং শক্তিশালী প্রমাণের দিক দিয়ে তাদের লেখা ও রচনাগুলো প্রাচ্যবিদদের লেখা ও রচনার তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এছাড়া, তাদের লেখা ও গবেষণাসমূহ সব ধরণের বিশুদ্ধতা ও সর্বশেষ যোগ্যতার স্বাক্ষরবহনকারী হতে হবে, হতে হবে নির্ভুল যার মধ্যে জ্ঞানগত কোন ত্রুটি থাকবে না।

প্রাচ্যবিদদের লেখা ইলমি বই-পুস্তকগুলো যাচাই-বাছাই করতে হবে :

একইভাবে এসব আলেম ও চিন্তাবিদদের আরো একটি কাজ করতে হবে। তা হচ্ছে, সততা ও বাস্তবতার আলোকে প্রাচ্যবিদদের লেখা বই-পুস্তকসমূহের

---

১. প্রসঙ্গক্রমে স্বীকার করতে হয়, পাকিস্তানের লাহোরস্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আলোচ্য বিশ্বকোষটির যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তা অনেকাংশে নিখুঁত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। জ্ঞানগত মূল্যবিচারে তা স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পর্যালোচনা ও সঠিক যাচাই-বাচাই করতে হবে। যাতে অর্থ উদঘাটন ও মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে তাদের যে ভুলত্রুটি রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের দ্বিধাসৃষ্টির যে ব্যাধি রয়েছে, তা যেন উম্মোচিত হয়ে যায়। যে সব উৎসের উপর নির্ভর করে তারা এসব লেখা-লেখি করেছে, তার দুর্বলতা এবং তা থেকে যেসব ফলাফল বের করে থাকে সেগুলো যে ভুল তা যেন মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সবাই যেন জানতে পারে, প্রাচ্যবিদদের অনেকেই নিজেদের অন্তরে ইসলামের প্রতি কী জঘন্য শত্রুতা পোষণ করে বেড়ান এবং সেসব গোপন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কেও যাতে সবাই অবগত হয়, যা তারা তাদের দীক্ষা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধারণ করেন। সবাই যেন বুঝতে পারে, এসবই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র যা অবশ্যই নস্যাৎ করে দিতে হবে।[১]

গঠনমূলক ও ইতিবাচক একটি কর্মযজ্ঞ নিতান্ত প্রয়োজন :

এমন একটি ইতিবাচক কর্মযজ্ঞ হাতে নিতে হবে যাতে থাকবে বিশ্লেষণমূলক বই-পুস্তক প্রণয়ন, অত্যন্ত যত্ন ও যোগ্যতার সাথে সূত্রসহ ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে সুগভীর প্রবন্ধ রচনা এবং বিভিন্ন উপকারী ও বিস্তারিত নির্ঘন্ট তৈরি করা (এসব বিষয়কেই প্রাচ্যবিদদের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়)। এমন সব বিষয়ের প্রতি পাঠকদের সন্ধান দেয়া যা এখনো পর্যন্ত অব্যবহৃত ছিল এবং এমন এমন বই ও সূত্র পেশ করা যা সাধারণত: লেখকদের কল্পনায়ও আসে না; অথচ তা মূল বিষয়ের অন্তর্ভূক্তও নয়, অন্তর্ভূক্ত নয় সেই নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসেরও যা প্রাসাদ, শাসক পরিবার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বড় বড় ঘটনা নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। এসব কিছুই হতে হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণমূলক, সংক্ষিপ্ত এবং অকৃত্রিম ও বাহুল্যমুক্ত। উপর্যুক্ত এ ইতিবাচক কর্মযজ্ঞ এবং জ্ঞানভিত্তিক কর্মযজ্ঞের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে হবে। শেষোক্ত জ্ঞানভিত্তিক কর্ম বলতে এখানে উদ্দেশ্য, ওই প্রাচ্যবিদদের লেখা বই-

---

১. লেখক জুলাই ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের লাহোর সফরকালে অবগত হন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র সীরাত বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণ যেসব বই-পুস্তক লিখেছে তার জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা, যাচাই-বাছাই এবং এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়ার নিমিত্ত প্রফেসর যফর আলী কুরাইশি একটি সুন্দর প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি ইংরেজিতে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান সন্দর্ভও রচনা করেছেন। তার সেবামূলক একক প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরী দেখে লেখক যারপরনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। পাশাপাশি অবাকও হয়েছেন এ জন্যে যে, কোনো বড় সংস্থা কিংবা কোনো মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে এ যাবত তিনি কোনো ধরণের মূল্যায়ন ও অনুপ্রেরণা পাননি।

পুস্তকের জ্ঞানভিত্তিক যাচাই-বাছাই করা এবং তা করতে হবে নির্মল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, ভদ্র ও মার্জিত বাক্যে, যথাযথ শব্দের মাধ্যমে; যাতে থাকবে না কোন ধরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অযাচিত দোষারোপ কিংবা কল্পনাপ্রসূত বাক্যবিলাস।

এতদোভয়ের সমন্বয় ব্যতিরেকে আর যা কিছু হবে সবই বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার মূল্য হারাবে। তার কোনো প্রভাবও পড়বে না পাঠকের অন্তরে। এ দু'য়ের মাঝখানে অর্থাৎ উপরিউক্ত ইতিবাচক কর্ম ও জ্ঞানভিত্তিক যাচাই-বাছাইয়ের মাঝখানে সমন্বয় ছাড়া মুসলিম বিশ্বের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণি প্রাচ্যবিদদের বিষাক্ত চিন্তাধারা এবং জ্ঞানগত প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিকে মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে মেধাবী ও সাহসী শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ শ্রেণির লোকেরা শিক্ষা অর্জন করে থাকেন ইউরোপ, আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অথবা নিজ দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। পাশ্চাত্যের যেসব ভাষা তাদের আত্মস্থ সেসব ভাষায় ইসলামকে অধ্যায়ন করতে পছন্দ করেন তারা।

মানব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে এবং কোনো প্রয়োজনে শূন্যতা দীর্ঘস্থায়ী থাকে না। এটা সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানব প্রকৃতির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর রীতি বিরোধী। প্রয়োজনকামী যে কেউ এসে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নেবে, সুস্থ কিছু না ফেলে মন্দ কিছু দিয়ে হলেও সে তার প্রয়োজন পূরণ করে নেবে। যতদিন পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এ সমাজ– যা পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও পন্ডিতদের প্রভাব তলে নিয়মিত দ্রবীভূত হয়ে আছে– প্রাচ্যবিদদের প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না, ততদিন পর্যন্ত মানসিক অস্থিরতা, চিন্তাগত ফিৎনার ঘূর্ণিঝড় বইতে থাকবেই মুসলিম দেশসমূহে এবং তাদের অসুস্থ চিন্তা-ভাবনাগুলো অবশেষে পাশ্চাত্যকরণ ও তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।

এ আন্দোলনের ফলে যখন তাদের কোনো ধরণের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাসিল হয়ে যায়, তখন তারা ইসলামের মূল রূহের সাথে সাংঘর্ষিক এমন সব জিনিস সমাজে ও শাসনে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টায় মেতে উঠে। এর মাধ্যমে তারা এমন একটি সমাজের রূপ দিতে চায়, যার সাথে আদি মুসলিম সমাজের কোনো মিল থাকে না; যা কিছু সাদৃশ্য থাকে, তা হচ্ছে শুধুই জাতিয়তা ও জাতিগত পরিচয়ে। তবে তা এমন এক বিদেশী সমাজ– অবশ্যই হয় যা বাস্তবতা ও প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় পাশ্চাত্য ও পুঁজিবাদের দিকে। তখন মুসলিম বিশ্বের নেতা ও জ্ঞানপ্রবরদেরকে ফার্সি ভাষায় রচিত কবিতা দিয়ে সম্বোধন

করাটা সমীচীন হয় যার মর্মার্থ অনেকটা এরকম; কবি এমন সব পাশ্চাত্যমুখী মুসলিম নেতা ও জ্ঞানীগুণীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

'হে বেদুঈন বন্ধু আমার,
থামো, থামো, বলছি তোমাকে,
গন্তব্য তোমার পবিত্র কা'বা,
অথচ তুমি যে পথে চলেছ,
সেটা তো তোমাকে নিয়ে যাবে নিশ্চিত তুরস্কে।'

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সম্পাদিত ইসলামী গবেষণাকর্ম : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সম্পাদিত ইসলামী গবেষণা কর্মগুলোর কোনো ধরণের পর্যালোচনা কি আদৌ বাস্তবায়িত হয়েছে? ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার মুসলিম লেখক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী গবেষকগণ কি এ বিষয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন? এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও একটি নিরপেক্ষ ও বিশ্বস্ত পর্যালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন, যাতে আমরা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কতটুকু এগিয়েছি, তার পরিধিটা জানতে পারি। এভাবে জানতে পারতাম, ইসলাম ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব থেকে কতটুকু মুক্ত হতে পারলাম। চলুন, এ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কিছু কিছু কাজের উপর একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিই।

অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে অজানা নয়, মুসলিম বিশ্ব-বিশেষ করে এর চারটি রাষ্ট্র তথা তুরস্ক, মিসর, ইরান ও ভারতকে– খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন দর্শন ও চিন্তাধারার মুখোমুখি হতে হয়। এই পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং এইসব বাস্তবতার দাবি ছিল প্রচুর পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রোডাক্‌শন এবং যেসব মুসলিম দেশ ও সমাজ এ বাস্তবতা ও পরিস্থিতির শিকার সেসব দেশ ও সমাজে বহুল প্রচলিত ও সর্বাধিক উন্নত ইউরোপীয় ভাষায় বিপুল পরিমাণে ইসলামী বই-পুস্তক রচনা করা। অন্তত: ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস, উসূল তথা মূলনীতি, আইন-কানুন, ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ইসলামের স্বর্ণ যুগের ইতিহাস, মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন যুগ, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামের নৈতিক দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে উন্নত মানের বই-পুস্তক রচনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

এসব দেশ ও সমাজের উচিত ছিল অন্তত: ইংরেজি বা ফরাসি কিংবা জার্মান অথবা হল্যান্ডি[১] ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা গবেষণা ও সম্পাদনার জন্যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনার জন্যে, এর দুর্বল দিকগুলোকে প্রকাশ করার জন্যে এবং ইসলামের সুন্দর সুন্দর দিকগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে। প্রয়োজন ছিল, এসব দেশের মুসলিম সন্তানদের উপর্যুক্ত ভাষাসমূহে তাদের নিজস্ব লেখার যোগ্যতা ও বাগ্মীতাকে উন্নত পর্যায়ে ব্যবহার করা। তাতে অল্প সময়ের মধ্যে এমন এক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তৈরি হয়ে যেত– যা একদিকে মুসলিম যুবসমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস এবং ইসলামের আত্মনির্ভরতার প্রতি তাদের অনুভূতির যোগান দিত, অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও ইউরোপ-আমেরিকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ প্রাচ্যবিদদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলেও অন্তত: ইসলামকে আন্তরিকভাবে অধ্যয়ন করার জন্যে বাধ্য করত। পাশাপাশি তা ইসলামী গবেষণা, ভাষা ও সাহিত্যগত উপস্থাপনার এমন এক বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের সৃষ্টি করতে পারত– যার প্রচন্ড ঢেউগুলো ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দেয়ালে দেয়ালে গিয়ে আঘাত হানত।

প্রত্যাশা ছিল, বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় দক্ষ ইসলামের এসব সন্তানরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন-কানুন, বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা ও ইতিহাসবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়াবলী দিয়ে সম্মৃদ্ধ করে দেবেন। এসব স্পর্শকাতর বিষয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে তারা প্রাচ্যবিদদের প্রতি এমন মুখাপেক্ষী অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, যাতে এসব ছাত্রদেরকে ইরান ও আরব দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কোনো নিকলসন (Nicholson), কোনো ব্রাউন (Browne) কিংবা কোনো হিট্টি (Hitti)'র উপর নির্ভর করতে না হয়; ইসলামী শরিয়াহ, ফিকহ ও হাদীস সংকলনের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যাতে কোনো গোল্ডযিহার (Goldziher) কিংবা কোনো শাখ্ত (Schacht) এর উপর নির্ভর করতে না হয়; কুরআনের বিজ্ঞান ও কুরআন মজীদের ভাষা তথা আরবি ভাষা, সাহিত্য ও কবিতা বিষয়ে অধ্যয়নের জন্যে কোনো মারগুলিয়থ (Morgolioth) এর উপর যাতে নির্ভর করতে না হয়

১. এ চার ভাষাতেই ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে বিপুল সংখ্যায় বই-পুস্তক রচিত হয়েছে, সম্পাদিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণা কর্ম।

এবং একইভাবে ইসলামী যুগে সম্পন্ন লেখালেখি ও গ্রন্থরচনার বিভিন্ন তৎপরতা, ইসলামী জ্ঞান ও ঐতিহ্য, মুসলমানদের কলম ও জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ফসল ইত্যাদি....... বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে যাতে কোন ব্রোক্যালমান (Brockelmann)[১] এর উপর নির্ভর করতে না হয়।

কারণ, এসব বিষয় সেই চিন্তাগত ধর্মত্যাগের সামনে যা আধুনিক শিক্ষিত মেধাবী ইসলামী যুবসমাজকে প্রায়ই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যা সেসব দেশে অরণ্যে অনলের মত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে যা একসময় পশ্চিমাদের উপনিবেশ হিসেবে ছিল- শুধু একটি সুরক্ষিত প্রাচীর হয়েই দাঁড়াতো না; বরং তা ইউরোপের দেশে দেশে ইসলামী দাওয়াতের প্রসার, ইসলামকে জানার এবং পবিত্র কুরআন ও মহানবীর সীরাতকে জানার ক্ষেত্রে চারিদ্বার উম্মুক্ত করে দিত। হয়ত: পরবর্তীতে আল্লাহর জমিনের এসব ভূখন্ডে বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান, তাদেরকে ইসলামের নির্মল ঝর্ণার প্রতি আকৃষ্ট করত, উদ্বুদ্ধ করত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে।

আক্রান্ত দেশসমূহে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় জ্ঞানভিত্তিক গবেষণাকর্মের স্বল্পতা :

সমস্ত দলিল ধারণ প্রমাণ ইংগিত করছিল, অচিরেই মুসলিম বিশ্বে ইসলামী বিষয়াদিতে লেখালেখি, সম্পাদনা ও গবেষণা কর্মের এক নতুন যুগের সূচনা ঘটবে। বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ভাষায়। ফলশ্রুতিতে তা উন্নত মানের এমন এক রচনা ভান্ডারের রূপ লাভ করবে যার ভাষাগত মাধুর্য, পদ্ধতিগত সৌন্দর্য, প্রামাণ্য শক্তি, চমৎকার উপস্থাপনাভঙ্গি এবং রচয়িতাদের পান্ডিত্য ও রচনা-সামর্থ্য দেখে খোদ ইউরোপীয় ও আমেরিকান লেখকবৃন্দ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, যা এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যে যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষ স্থানীয় লোক এবং বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষার পন্ডিত ও সমালোচকদের সমন্বয় ঘটেছে, সবার সামনে আমার ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগত বিস্ময় প্রকাশ করতে হচ্ছে এ বলে যে, এই প্রত্যাশাটা অপূর্ণই রয়ে গেছে। এ দুঃসংবাদ প্রচুর অধ্যয়নকারী ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী একজন বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদকে যারপরনেই অবাক হতে বাধ্য করে।

---

১. সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা, তার জ্ঞানগত মূল্য এবং তার দ্বারা পাঠকশ্রেণি যে উপকৃত হচ্ছে, তা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি।

অন্যান্য আক্রান্ত অঞ্চলের মাঝে ভারতের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য :

যে সব মুসলিম দেশ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা পাশ্চাত্য জোয়ারের সম্মুখীন, সেসব দেশের তালিকার অগ্রভাগে ছিল ভারতবর্ষ। এ ভারতবর্ষকে ব্রিটেন সরকার পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এক শক্তিশালী প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। এসব বিষয়ে ভারত ছিল অত্যন্ত আপোসহীন। কারণ, ব্রিটিশরা গোটা ভারতের উপর তাদের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করে ফেলেছিল একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই যখন অন্যান্য দেশ পরোক্ষভাবে তাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এজেন্টদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা একটু একটু প্রভাবিত হচ্ছিল। এসবের পাশাপাশি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব– মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৫৭ সালের পর কার্যত আলীগড়ে (Aligarh) একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দিয়ে ছিলেন 'মাদরাসাতুল উলূম' (সাইন্স স্কুল)। বিবেক-বুদ্ধি, সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে যার তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব ছিল বিজ্ঞ ইংরেজ প্রবরদের হাতে, যেমন– মিস্টার বীক (Mr. Beek), মিস্টার মুরিসন (Mr. Morison), মিস্টার আরচিবোল্ড (Mr. Archibold) প্রমুখ। এ স্কুলটি ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। পরবর্তীতে এ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় গোটা ভারতবর্ষের– বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে খায়বার গিরিপথ পর্যন্ত– মেধাবী যুবসমাজকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করে।

এসব কিছু সত্ত্বেও ভারতীয় তথা ভারতবর্ষের মুসলিম জাতি ছিল অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় ধর্মীয় অনুভূতির দিক দিয়ে অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ অনুভূতিপরায়ণ[১], অত্যন্ত কোমল, ইসলামী সচেতন এবং ইসলামের বিষয়ে

১. এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে, ভারতের উত্তর প্রদেশের -তথা তৎকালীন ভারতের সব চাইতে বড় ও উন্নত প্রদেশের- প্রশাসক স্যার ওলিয়ম মূর (Sir William Muir) যখন ইংরেজী ভাষায় তার প্রসিদ্ধ 'মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন চরিত' (Life of Mohamet) শীর্ষক বইটি রচনা করেন, যাতে সীরাতে নববীর গাম্ভীর্যবিরোধী ধৃষ্টতা এবং কোনো কোনো বাস্তবতাকে মেটানোর অপপ্রয়াস সন্নিবেশিত ছিল, তখন খোদ স্যার সৈয়দ আহমদ খান যিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে কিছু কিছু বিষয়কে গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন এবং ইংরেজ সরকার ও সরকারের অনেক উচ্চ পদস্থ লোকদের সাথে যার সখ্যতা ছিল, পারস্পরিক বিশ্বাস ছিল- তিনিও সীরাতে নববীর প্রতি এ বেয়াদবি বরদাশত করতে পারেননি। তিনি এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ান। এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ১২৮৬ হি:/১৮৬৯ইং সালে তিনি লন্ডন সফর করেন। এ উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রয়োজনে তিনি তার নিজস্ব কিছু সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রও বিক্রয় করে দেন। অবশেষে তিনি 'খুতবাতে আহমদিয়া' শীর্ষক তাঁর

যাদের রয়েছে নিতান্ত আত্মসম্মানবোধ। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, যার উল্লেখ এখানে নিস্প্রয়োজন। এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে, খেলাফত আন্দোলনের পর ইসলামের ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও ধর্মীয় প্রতীকগুলোকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের প্রবল আগ্রহ এবং শক্তিশালী ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে -অর্থাৎ বিদেশী বিভিন্ন ভাষায়- প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হলেও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হতে কিন্তু তাদের কীর্তি ও অবদান বহুগুণে বেশি।

খ্রিস্টবাদের জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা প্রসঙ্গে :

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় আত্মসম্মানবোধ এবং খ্রিষ্টান মিশনারীর চ্যালেঞ্জ যা প্রতিশোধপরায়ন খ্রিস্টবাদী ইংরেজ শাসন কায়েমের পর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতি ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার যে মানসিকতা এ অঞ্চলের মুসলমানগণ ধারণ করতেন। তার ফলে খ্রিষ্টবাদের জবাবে এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট তথা তাওরাত ও ইঞ্জীলের সমালোচনামূলক সর্বোত্তম ও সর্বাধিক শক্তিশালী বইটি রচিত হয়। ভারতীয় মুসলিম জাতি খ্রিষ্টান মিশনারী কর্মকান্ডের সরাসরি মোকাবেলা করেছে। তাদের পূর্বে কোনো আরব কিংবা মুসলিম দেশের দ্বিতীয় কোনো জাতি এ ধরণের যুদ্ধে উপনীত হয়নি, মোকাবেলা করে নি এ ধরণের মিশনারী প্রচার-প্রসারের।

মহান আল্লাহ এ আন্দোলন- যা প্রতিরক্ষামূলক নয়- বরং আক্রমণাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে এমন কিছু মহাপুরুষকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, যারা এই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে নিজেদেরকে তৈরি করে তোলেন, যে কাজ হতে মুসলমানরা (বিশেষতঃ আলেম ও লেখক সমাজ) পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় হেতুর অভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিমুখ ছিলেন। এসব মহাপুরুষের শীর্ষভাগে ছিলেন চিরসংগ্রামী মুজাহিদ আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানভী (১২৩৩ হিঃ-১৩০৮হিঃ)। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্যে ইলম, তর্কজ্ঞান ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা, মেধা ইত্যাদি যা যা দরকার সব ধরণের যোগ্যতাই বিদ্যমান ছিল আল্লামার মধ্যে।

সেই বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন– যা তার গ্রন্থমালার তালিকায় অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভবতঃ সেটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হলেও তার মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক গবেষণা কর্মের প্রাথমিক যা যা প্রচেষ্টা হতে পারে, সব ধরণের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল।

তবে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ছিল না তাঁর এবং ছিল না বিদেশি উৎসগুলো সম্পর্কে সরাসরি উপকৃত হওয়ার সুযোগ। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাকে মিলিয়ে দিলেন এক নেহায়েত গায়রতমন্দ তথা আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মুসলমান। তিনি হচ্ছেন ড. মুহাম্মদ ওজির খান আকবরাবাদী। তিনি ১৮৩২ ইংরেজি সালে লন্ডন সফর করেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর লেখাপড়া করার লক্ষ্যে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি তিনি এ সফরে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানেও দক্ষতা অর্জন করেন, গ্রীক ভাষা শেখেন। ফলে সরাসরি মূল উৎস হতে খ্রিষ্টবাদ অধ্যয়ন করার প্রতি মনযোগ দেন এবং খ্রিষ্টবাদবিষয়ক বই-পুস্তক সংগ্রহ করেন।

তার সংগৃহীত বই-পুস্তক একটি মূল্যবান গ্রন্থাগারের রূপ নেয় এবং ভারতে ফেরার সময় এ মূল্যবান গ্রন্থাগারও সাথে নিয়ে আসেন– যা আল্লামা কিরানভীর খুবই কাজে আসে পরবর্তীতে। তিনি গ্রন্থাগারের দুর্লভ বই-পুস্তক দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হন। তখন খ্রিষ্টান পাদ্রী ড. সি জে ফানদার (Dr. C. G. Pfander) এবং আল্লামার মাঝে এক বির্তকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এ ড. ফানদার হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মুসলিম বিশ্বের আলেম ও মুসলিম স্করারদের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি 'মিযানুল হক' শিরোনাম দিয়ে একটি বই লিখেছিলেন এবং তার ধারণা, এ বইয়ের জবাব দেয়ার মত সামর্থ্য মুসলমানদের নেই[১]। এই ঐতিহাসিক বিতর্কটি রজব ১২৭০ হি: মোতাবেক ১০ ই এপ্রিল ১৮৫৪ ইংরেজি সালে আগ্রাস্থ আকবরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়।

আগ্রা ছিল তৎকালীন ভারতের কেন্দ্রীয় উত্তর প্রদেশের অন্যতম জেলা এবং খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতার অন্যতম ক্ষেত্র। এ কারণে আগ্রার যে মহল্লায় বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়, তা 'আবদুল মসীহ' (অর্থাৎ মসীহ আ. এর গোলাম) নামে প্রসিদ্ধ ছিল[২]। বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার গভর্ণরগণ, ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং শহরের বেশ কিছু গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ। দীর্ঘ বিতর্ক শেষে পাদ্রী ফান্দার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ইঞ্জীলের আটটি স্থানে বিকৃতি ঘটেছে। দ্বিতীয় দিন উপস্থিতির সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তাতে ইংরেজ

---

১. ১৮৪৯ ইংরেজি সালে ফরাসি ভাষায় বইটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আগ্রা থেকে। উর্দু ভাষায় তৃতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮৫০ ইংরেজি সালে এবং বইটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় ১৯১০ সালে।

২. মহল্লাটির নামকরণ সম্ভবত: কোনো নতুন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীর খ্রিষ্টান নামেই করা হয়েছিল।

শাসকগোষ্ঠী, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, হিন্দু ও শিখরাও বিরাট সংখ্যায় অংশ নেয়। বিতর্কে পাদ্রী ফান্দারের দুর্বলতা ও দুরাবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে, তৃতীয় দিন পাদ্রী বিতর্কে আর উপস্থিত হননি। তারপর থেকে ওই পাদ্রীর একটা নিয়মে পরিণত হয়ে ছিল যে, যেখানেই আল্লামা কিরানভীর উপস্থিতির সংবাদ পেত, সেখান থেকে সে প্রস্থান করতো।

আল্লামা কিরানভী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইযহারুল হক'[১] রচনা করেন উসমানী খলীফা সুলতান আবদুল আজীজ ও মহামান্য বাদশাহ খায়রুদ্দীন পাশার প্রস্তাবে। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পর আল্লামা মক্কা মোকাররমা হিজরত করেন। মুসলমানদের খলীফার আবেদনে কনস্টান্টিনুপল ভ্রমণ করেন ১৮৬৪ সালে। অত:পর ১২৮০ হিজরি সালে আস্তানাতেই তিনি এ ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থে তিনি আক্রমণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ঠিক যেমনটি করেছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তার 'আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসীহ' শীর্ষক গ্রন্থে।

এছাড়া আল্লামা ওই আলোচ্য গ্রন্থে স্পষ্ট পরস্পর বিরোধী বিষয় এবং এমন সব সচরাচর ও স্বাভাবিক ভুলের উপর নির্ভর করেছেন– যা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেখান থেকে গাণিতিক পদ্ধতিতে এমন সব ফলাফল বের করে আনেন যাতে কারো দ্বিমত করার কোনোই সুযোগ নেই। খ্রিষ্টান ধর্মের অন্যতম অনুষঙ্গ ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে বিবেকের মানদন্ডে রেখে জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি কুরআন করীম সম্পর্কেও আলোচনা করেন সেই গ্রন্থে। সেটা যে আল্লাহর একান্ত বাণী তা প্রমাণ করে ছাড়েন। মহানবী (সা.) এর সীরাতের উপর আলোকপাত করেন, মহানবী (সা.) এর শানে যে সব সুসংবাদ ও মু'জিযার কথা এসেছে, সেগুলোও উল্লেখ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থটি ইউরোপের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুদিত হয়। ইংল্যান্ডের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা 'লন্ডন টাইমস' (London Times) এ গ্রন্থের উপর মন্তব্য করে লিখে, 'জনগণ যদি এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে থাকে, তাহলে বিশ্বে খ্রিষ্টান ধর্মের অগ্রগতি নিশ্চিত থেমে যাবে।'[২]

---

১. এছাড়া খ্রিষ্টবাদের সমালোচনা ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আল্লামা রহমতুল্লাহ বিরচিত আরো তিনটা গ্রন্থ রয়েছে। তা হচ্ছে, 'ইযালাতুল আওহাম', 'ইযালাতুল শুকূক', ও 'আসাহ্‌হুল আহাদীস ফী ইবতা'লিল তাসলীস'।

২. লেখক কর্তৃক লিখিত এবং ১৯৮১ সালে মুদ্রিত 'ইযহারুল হক' এর কাতারস্থ সংস্করণের ভূমিকা থেকে সার সংক্ষেপ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলিম মণীষীও 'পবিত্রগ্রন্থ' তথা বাইবেলের সমালোচনা এবং খ্রিষ্টবাদের জবাবে বড়মাপের বেশ কিছু সমালোচনামূলক মূল্যবান বই-পুস্তক রচনা করেন। তাদের মধ্যে 'আল ইস্তিফ্সার' ও 'আল ইস্তিব্শার' শীর্ষক বইদ্বয়ের রচয়িতা আল্লামা সায়্যিদ আলে হাসান আল মুহানী (১২৮৭ হি:) এবং 'আল বুশরা' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ এনায়েত রাসূল চিরিয়াকূটী (১৩২০ হি:) হলেন অন্যতম। শেষোক্ত জন তো হিব্রু ভাষাও শেখেন এবং ভালভাবে তা রপ্ত করেন।

এ ক্ষেত্রে আরো অবদান রাখেন প্রসিদ্ধ 'তাফসীরে হক্কানী'র লেখক শায়খ আবদুল হক হক্কানী, নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুংগেরী, কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপূরী, 'তারীখুস সুহূফ আস সামা'ইয়্যাহ' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক সায়িদ নওয়াব আলী লাখনভী এবং মাওলানা সানাউল্লাহ আমৃতচরী (রহঃ)।

খ্রিষ্টবাদের জবাবে এভাবে ভারতবর্ষে তৈরি হয়ে গেলো মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ এক বৃহত্তম গ্রন্থশালা। এর নেপথ্যে অবশ্যই বেশকিছু কারণ যেমন ছিল, ছিল আপন ধর্মের প্রতি মুসলমানদের গায়রত ও আত্মসম্মানবোধ এবং তেমনি ছিল অন্যান্য ধর্মের জ্ঞানগত ও প্রচারণামূলক আক্রমণের সামনে এ অঞ্চলের মুসলমানদের পাহাড়সম অটলতা।

পূর্ণাঙ্গ একটি শতাব্দীর ফসল :

ইংরেজি ভাষার প্রতি ভারতীয় মুসলিম জাতির আগ্রহ এবং তা শেখা ও আয়ত্ব করার প্রতি তাদের গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে আলীগড়ে 'সায়েন্স স্কুল' প্রতিষ্ঠার বৎসর তথা ১৮৭৫ সালকে যদি আমরা যুগের সূচনা পর্ব হিসেবে বিবেচনা করি এবং মাঝখান থেকে ১৭৫৭ সালকে হিসাবের বাইরে রাখি যখন মুসলমানরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং ইংরেজদের ধারাবাহিক আক্রমণ ও বিজয়ের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন আর একইভাবে ১৯৮১ সালকে যদি বিবেচনা করি এ যুগের শেষপর্ব, যার মধ্যবর্তী সময়ের ভিতর (M. A. O. College) কলেজ যা পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং যাতে এমন কিছু লোক তৈরি হয় যারা নিজেদের ইসলামী গায়রত ও দ্বীনি আত্মসম্মানবোধ এবং খোদ ইংরেজদের মত ইংরেজি ভাষার উপর তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হন, তাহলে আমরা দেখতে পাই, এই দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়টা প্রায় এক শতাব্দীর চেয়েও

বেশি। এ সময়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় রচিত এমন কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক আমরা খুঁজে পাই– যা এ দীর্ঘ সময়ের তুলনায় খুবই স্বল্প। তবে তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি।

চমৎকার ইংরেজি ভাষায় রচিত ভারতীয় মুসলিম লেখকদের কতিপয় গ্রন্থ :

ইংরেজি ঊনবিংশ শতাব্দির শেষাংশে এবং বিংশ শতব্দির প্রারম্ভে বেশ কিছু ইংরেজি ভাষার লেখককে আমরা পাই যারা ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী সভ্যতার বিষয়ে এমন কিছু গ্রন্থ রচনা করেন, যার ভাষাগত মাধুর্যে খোদ ইংরেজরা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ। এসব মুসলিম লেখক তাদের সম্মৃদ্ধ প্রবন্ধ, মূল্যবান বিষয়বস্তু এবং সুন্দর ও মনোরম উপস্থাপনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাদের গুরুত্ব হাসিল করতে সক্ষম হন। আলোচ্য মুসলিম লেখকদের শীর্ষে ও অগ্রভাগে ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী, যিনি রচনা করেন স্বীয় গ্রন্থ 'দ্য স্প্রীট অব ইসলাম' (The Spirit of Islam)। এ গ্রন্থে লেখক কর্তৃক সন্নিবেশিত সকল চিন্তা-ভাবনার সাথে আমরা একমত হতে না পারলেও গ্রন্থটি ইংলেন্ডের সাহিত্য ও জ্ঞানীমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়। শুধু তাই নয়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঘা বাঘা ইংরেজ পন্ডিতপ্রবরদেরকে ইসলামের সত্যতা ও বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য করে এই গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ 'অসবোর্ন' (Osborn) বলেন :

'এই গ্রন্থ সত্যই প্রসংশার দাবিদার। এমন এক পদ্ধতিতে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে যাতে ইংরেজি ভাষার উপর লেখকের দক্ষতার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শিক্ষিত ইংরেজদের মধ্যেও খুব কম লোক সেই পদ্ধতি ও স্টাইলে তার সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম। সাধারণতঃ ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদের রচনা পদ্ধতিতে যে সব দোষ পরিলক্ষিত হয়, তা এই লেখকের গৃহীত পদ্ধতিতে নেই...। ভারতীয় মুসলমানদের অভিনন্দন জানানো দরকার এ জন্যে যে, তাদের মধ্যে এমন উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছার মত লোকও রয়েছে। আর যে ব্যক্তির প্রাথমিক গবেষণাকর্মের মধ্যে এমনতর গ্রন্থ রয়েছে, ভবিষ্যত জীবনে তার লেখনি শক্তিতে যে এক সুগভীর ও সক্রিয় প্রভাব থাকবে না– তা অসম্ভব। তবে আলোচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই দ্বিমত রয়েছে। পরবর্তীতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিমতের কারণও উপস্থাপন করবো শীঘ্রই।'[১]

---

১. ডঃ আহমদ আমীন রচিত 'যুআমা উল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদীস', পৃষ্ঠাঃ ১৪০।

সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'অ্যা শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য সারাসিনস' (A Short History of The Saracens) তথা 'আরবের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গ্রন্থটিও তার গতিময় ভাষা ও লেখনী মাধুর্য এবং গ্রন্থ রচনায় লেখক কর্তৃক গৃহীত মধ্যমপন্থার কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে।

দ্বিতীয় মুসলিম লেখক যার খ্যাতি ভারতের গন্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে যায়, তিনি হলেন 'সালাহ উদ্দিন খোদাবখশ'। যিনি ইসলামবিষয়ক বেশকিছু বই জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেন। ইংরেজি ভাষায় সরাসরি রচিত তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কন্ট্রিবিউশন টু দ্য হিস্ট্রি অব ইসলামিক সিভিলাইজেশন' (Contribution to the History of Islamic Civilization) শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড[১] এবং 'ইন্ডিয়া-ইসলামিক অ্যাসেস' (India-Islamic Essays) অন্যতম প্রসিদ্ধ।[২] তবে আফসোসের বিষয়, তার অনেক মত ও সিদ্ধান্ত সেই সব শিক্ষিত লোকদের মতবিরোধী যাদের নিকট ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান রয়েছে।

এ সময়ে (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ এবং বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে) ইংরেজি ভাষায় রচিত মুসলিম লেখকদের লেখাপত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল: পাশ্চাত্য ও পশ্চিমা দর্শন এবং সেই প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অতিশয় মুগ্ধতা যা তখনও তার শৈশব কাল অতিক্রান্ত করছিল। অদৃশ্য বাস্তবতা, নবী মু'জিযা ও বিবেক দ্বারা বোধগম্য নয় এমন বিষয়াবলির ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ছিল কট্টর এবং একেবারে নিরুত্তাপ ও ঠান্ডা মেজাজের। এসব অদৃশ্য ও বিবেকবহির্ভূত বিষয়াবলির মাঝে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক তত্ত্বসমূহের মাঝে সমন্বয়, একইভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ইসলামী সভ্যতার মূল ভাবনা মাঝে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহ ছিল কৃত্রিমতায় ভরা। পাশাপাশি এসব মুসলিম লেখকদের অধিকাংশ বই-পুস্তকেরই লেখার পদ্ধতি ছিল আত্মরক্ষামূলক ও ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক (Apologetic)।

এসব লেখকের পর সেসময় ইংরেজি ভাষার এমন অন্য কোনো লেখক যদি থাকেন যাদের পারদর্শিতা, মূল্যবান লেখা ও রচনাশৈলী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হতে পারে, যাদের উন্নত লেখা পৃথিবীকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, ইউরোপের

---

১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৩০ ইং। প্রথম খন্ড হচ্ছে জার্মান লেখক ফন ক্রেমার (Von Kremer) বিরচিত গ্রন্থের অনুবাদ।

২. রচনা ১৯১২ ইং সাল।

বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত যাদের রচনা থেকে উপকৃত হয়েছে এবং নিজেদের লেখা ও রচনাসমূহে যাদের বইকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছে... এমন লেখকের তালিকায় ছিলেন দু'জন। একজন হলেন 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তাধারার নতুন বিন্যাস' (তথা Reconstruction of Religious Thought in Islam) শীর্ষক গ্রন্থের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল[১]।

মূলত আলোচ্য গ্রন্থটি ছিল ভারতের মাদ্রাজ শহরে লেখকপ্রদত্ত লেকচারসমূহের সংকলন। যদিও গ্রন্থটিতে কিছু কিছু আক্বীদা ও দ্বীনি বাস্তবতার ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দার্শনিক গোঁড়ামি এবং কিছু কিছু বিরল মতামতও সন্নিবেশিত ছিল, যা সর্বজনগ্রাহ্য নয়[২]; তা সত্ত্বেও সংকলনমূলক এ গ্রন্থটি পাঠককে নবচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাতে প্রচুর মূল্যবান বিষয়াবলি স্থান পেয়েছে। ইউরোপের চিন্তাবিদগণ গ্রন্থটিকে যারপর নাই গুরুত্ব দেন এবং তারা তাদের লেখালেখিতে এ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেন।

একইভাবে (দ্বিতীয়জন) আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীও ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ করে ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও মাধুর্য, শক্তিশালী উপস্থাপনা এবং চমৎকার রচনাশৈলী ব্যবহারের কারণে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিরল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং অত্যন্ত সমাদৃত হন। পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ আরো বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশেও আলোচ্য অনুবাদের অনেক সংস্করণ বেরিয়েছে। একইভাবে মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথাল (M. M. Pickthall) কর্তৃক ভাষান্তরিত পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদও ভাষাগত মাধুর্য, রচনাশৈলী এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনুবাদকর্মটি ত্রুটিমুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও পাঠকমহলের প্রশংসা, আকর্ষণ ও সমাদর ঠিকই কুড়িয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যদি উর্দু ভাষার শক্তিশালী লেখক মরহুম আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী কর্তৃক কুরআন মজিদের ইংরেজি অনুবাদের মূল্যায়ন না করি, তাহলে তা বড়ই অধিকার ক্ষুন্নতা এবং অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। এ অনুবাদ কর্মের বাস্তব মূল্য হচ্ছে সেসব

---

১. গ্রন্থটি 'তাজদীদুল ফিকরিদ দীনি ফিল ইসলাম' শিরোনামে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন প্রখ্যাত লেখক আবক্কাস মাহমূদ এবং তা মিসরে মুদ্রিত হয়। একইভাবে গ্রন্থটি উর্দু ভাষায়ও অনূদিত হয়।

২. তাঁর এসব মতামতের ক্ষেত্রে দ্বিমত প্রকাশ করেন আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী এবং এই প্রবন্ধকারও স্বীয় গ্রন্থ 'রওয়ায়ে ইকবাল'এ এই বিষয়ে সতর্ক ইংগিত করেন।

সমৃদ্ধ টীকা-টিপ্পনি যা বিভিন্ন ধর্ম এবং খ্রিস্টান ও ইহুদি সূত্র বিষয়ে তাঁর গভীর ও বিস্তর অধ্যয়নের নির্যাস বলে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের স্বরূপ তুলে ধরতে এবং কুরআনের ই'জায তথা অলৌলিকতা প্রমাণ ও জোরালো করতেই তিনি তার এ বিস্তর অধ্যয়নকে ব্যবহার করেন। সমকালীন অন্য সব অনুবাদকের মাঝে মরহুমের এই বিষয়টিই স্বতন্ত্র। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এ অনুবাদটি যথাযথ মূল্যায়িত হয়নি এবং জ্ঞানী মহলে যে গুরুত্ব প্রাপ্য ছিল, তা এ ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি।[১]

দাওয়াত ও রচনার ক্ষেত্রে আহমদিয়া জামাতের কর্মকান্ড :

ইংরেজি ভাষায় ইসলাম ও সীরাতে নববীর পরিচিতিমূলক বই-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরী[২] নেতৃত্বাধীন আহমদিয়া জামাতেরও চোখে পড়ার মত কিছু কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক রচনাশৈলী অবলম্বনে লেখা তাদের এসব ইংরেজি বই-পুস্তক ভারতসহ বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষিত সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। ইংরেজি ভাষার মান মোটামুটি। এসব রচয়িতাদের শিরোনামে রয়েছেন আলোচ্য আহমদিয়া জামাতের শাখাপ্রধান মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরী। পবিত্র কুরআনের অর্থের ইংরেজি অনুবাদ বের করেন তিনি।

তার লেখা কুরআন মজিদের ইংরেজি অনুবাদ পড়ার জন্য ভারতের ভেতরে ও বাইরে বিরাটসংখ্যক আধুনিক শিক্ষিততের মাঝে গভীর মনযোগ দেখা যায়। এই অনুবাদের সাথে মাওলানার কলমে লেখা টীকা-টিপ্পনি ও তাফসীরও ছিল। সমকালীন যুগে ইংরেজি ভাষায় রচিত ইসলামী বই-পুস্তকের মধ্যে স্বীয় প্রয়োজন ও জ্ঞানপিপাসা মিটাতে পারার মত কোনো বই-পুস্তক যারা পায়নি এবং যাদের ধর্মীয় বোধগম্যতায় গভীরতা নেই– এমন অনেক লোকই আসক্ত হয় তার এ

---

১. 'তাজ কোম্পানী' (Taj Company) অনুবাদসহ এর প্রথম সংস্করণ বের করে। পরে নদওয়াতুল উলামাস্থ 'আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমী' অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে এ অনুবাদ কর্মের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

২. তিনি কাদিয়ানি সম্প্রদায় (যারা সন্দেহাতীতভাবে মির্জা গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস করে) থেকে উৎসারিত লাহোর শাখার সভাপতি। এ শাখার লোকেরা বিশ্বাস করে, মির্জা গোলাম আহমদ ছিলেন চৌদ্দ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মহান সংস্কারক। তাকে তারা প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবেও মানে। এখানে এসে উভয় দলের আক্বিদা-বিশ্বাস একীভূত হয়ে যায়। সকল মুসলমান তাদের এক অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এর উপরই পাকিস্তানে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের বই 'কাদিয়ানি ও কাদিয়ানিয়ত' এর 'লাহোরি শাখা' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

তাফসীরের প্রতি। তবে তার এ অনুবাদ এবং অনুবাদের উপর লিখিত তার তাফসীর ও টীকা-টিপ্পনিতে মু'জিযা ও অদৃশ্য বিষয়গুলোকে সাধারণ ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চরম পর্যায়ের ঝোঁক ও কট্টরপন্থা পরিলক্ষিত হয়। আরবি ভাষা এবং বর্ণিত স্পষ্ট শব্দ যদিও তা চায় না। এ রচনায় সেসব প্রাকৃতিক নিয়ম ও তত্ত্বের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত মানসিকতার ছাপ রয়েছে, যা তখনও তার শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত করছিল মাত্র[১]।

সীরাতের উপর লেখা তার গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে 'মুহাম্মদ দ্য প্রফেট' (Muhammad the Prophet)। গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের ভেতরে এবং বাইরে ব্যাপকহারে পঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে যাদের হাতে সীরাত বিষয়ে তখন অন্য কোনো বই ছিল না, তারা তার এ গ্রন্থটিকে লুফে নেয়। গ্রন্থটি তাদের সামনে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়ত ও রেসালতের মাহাত্ম্য তুলে ধরে। নবী কারীম (সা.) এর সমসাময়িক পরিবেশ ও পরিস্থিতির চিত্রায়ন এবং সমাজসংস্কারে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় বইটিতে। নবী জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও রয়েছে তাতে। এসবই প্রমাণ বহন করে, তখনকার সময়ে ইসলামের পরিচয় এবং ইসলামের পয়গম্বর (সা.) সম্পর্কে জানার জন্যে আধুনিক শিক্ষিত ও যুবসমাজের মধ্যে যে আগ্রহ ছিল, তা পুরণ করার মত সঠিক ইসলামী বই-পুস্তকের কত প্রয়োজন ছিল? ফলে, তারা যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথার্থ পূর্ণাঙ্গ বই পায়নি তখন তারা যা হাতের কাছে পেয়েছে তা দিয়েই তাদের পিপাসা নিবারণ করেছে।

এ ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরীর পরে যার স্থান তিনি হলেন তারই সতীর্থ ও সঙ্গী ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ইসলামী দাঈ এবং ইংরেজি ভাষার তুখোড় বক্তা খাজা কামাল উদ্দিন। তার লেখা দু'টি বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে যথাক্রমে: 'আদর্শ নবী' (The Ideal Prophet) ও 'খ্রিস্টবাদের উৎস' (Sources

১. এ সংক্রান্ত অদ্ভুত অদ্ভুত নমুনা ও উদাহরণ সম্পর্কে পড়ুন আমার 'কাদিয়ানি ও কাদিয়ানিয়ত' শীর্ষক বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়স্থ 'লাহোরি শাখার আক্বিদা ও ব্যাখ্যা'-এ। ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগত বাস্তবতা– যা করে নেয়া জরুরি তা- হচ্ছে, ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার পুরোধা এবং আলীগড় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানই পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই পন্থাটি বের করেছিলেন। পরবর্তীতে যারা এসেছেন, সবাই তার কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন এবং তার দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অনেক বিষয়ে পরবর্তীরা তাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এ ধরনের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে আর কি।

of Christianity)। মির্জা গোলাম আহমদের প্রতি অতিভক্তি এবং আক্বিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনিও ছিলেন তার বন্ধু ও নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরীর হুবহু ছায়াকপি। তিনি লন্ডনস্থ 'ওয়ার্কিং মিশন' (Working Mission) সেন্টারের অধিকর্তা।

সমসাময়িক গ্রন্থরচয়িতা :

উপর্যুক্ত শ্রেণীর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমরা যদি অন্যদিকে তাকাই, তাহলে ইংরেজি ভাষায় বই-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে অনেককে খুঁজে পাই। এদের মধ্যে যার জ্ঞান ও গবেষণাকর্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমানে খ্যাতি লাভ করেছে তিনি হচ্ছেন আমাদের সুযোগ্য বন্ধু ভারতীয় বংশোদ্ভুত ডঃ হামীদুল্লাহ হায়দারাবাদী। পবিত্র কুরআন মজিদের অর্থগুলোকে তিনি ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন, যা ফ্রান্সের জ্ঞানী ও শিক্ষিত মহলে অত্যন্ত সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে তার রচনা সমগ্রের মধ্যে আমি দু'টি বইয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

একটি হচ্ছে, 'ইসলামের পরিচয়' (Introduction to Islam) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)' (Muhammad Rasoolullah)। তাঁর এ দু'টি বইয়ের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষাভাষী হাজার হাজার মুসলমান ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন। তবে যে গ্রন্থটি তার মাহাত্ম্যের প্রমাণ বহন করে, তার জ্ঞানের গভীরতা ও দক্ষতা, জ্ঞান-গবেষণায় তার নির্ঘুম রাতযাপন এবং তার দীর্ঘ চিন্তাশক্তি নিয়োগ ও কঠোর পরিশ্রমের দলিল বহন করে, তা হচ্ছে 'সহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ' (Sahifa Hammam Bin Munabbih) শীর্ষক গ্রন্থ।

এ গ্রন্থটিতে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বোঝানো হয়েছে যে, হাদীস সংকলনের কাজটি খোদ নবী করিম (সা.) এর যুগেই আরম্ভ হয়েছিল এবং তা প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থকারদের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে কোনো বিরতি বা সময়শূন্যতা ছিল না। ডঃ সাহেব এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে হাদীসশাস্ত্রেরই খেদমত করেননি শুধু বরং গোটা ইসলাম ধর্মের এক মূল্যবান সেবা করেছেন– যার জন্যে তিনি সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ডঃ মুস্তাফা আজমির খেদমতগুলোকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যিনি ঐতিহাসিক সব তথ্যাদি দিয়ে ডঃ হামিদুল্লাহর মতকে

সমর্থন করেছেন। 'স্টাডিজ ইন-আর্লি হাদীস লিটারেচার' (Studies in-Early Hadith Literature) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করে তিনি ডঃ হামিদুল্লাহ্র কাজটাকে আরো সমুন্নত করেন। আরো শক্তিশালী প্রমাণ দিয়ে এবং আরো সবিস্তারে তার দাবিতে শক্তি যুগিয়েছেন। এছাড়া প্রফেসর এম, এ শাস্ত্রী রচিত 'আউটলাইনস অব ইসলামিক কালচার' (Outlines of Islamic Culture) এবং ডঃ বুরহান আহমদ ফারুকী রচিত 'মুজাদ্দিদ'স কন্সেপশন অব তাওহীদ' (Mujaddid's Conception of Tauhid) গ্রন্থগুলোও ইসলামী পাঠাগারের মূল্যবান সংযোজন।

ইংরেজি ভাষায় ইসলামবিষয়ক লেখকদের তালিকায় আরো যাদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, হাফেজ গোলাম সরওয়ার ও ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ হায়দারাবাদি যারা স্বীয় অন্যান্য গবেষণাকর্মের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআন মজিদের তাফসীরও লিখেছেন। এছাড়া রয়েছেন স্যার আমীন জংক, ডঃ মীর ওলিয়ুদ্দীন, ডঃ আবদুল মুয়ীদ খান, প্রফেসর জহির উদ্দীন ফারুকী[১], সৈয়দ মুজাফ্ফর উদ্দীন নদভী[২], হাজী মাওলানা ফজলুল করিম, সৈয়দ আতহার হুসাইন, সৈয়দ মুহিউদ্দীন প্রমুখ। কিন্তু এই সব কিছুই একটি পূর্ণাঙ্গ শতাব্দীর পরিধিকে অতিক্রম করেনি– যা ১৮৭৫ ইং সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৮১ ইং সালে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

'হেদায়েতপ্রাপ্ত' লেখকদের কতিপয় শক্তিশালী গ্রন্থ :

বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, একজন নবদীক্ষিত মুসলিম, ইসলাম ধর্মের সাথে সদ্য পরিচয় ঘটেছে যার, সেই ব্যক্তির হাতেই রচিত হলো ইংরেজি ভাষায় এমন দু'টি গ্রন্থ যা সমসাময়িক যুগে সুন্দরতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। এমন গ্রন্থ যা পাঠকের মাঝে ঈমান জাগায়, আত্মাকে শাণিত করে, পরিপুষ্ট করে হৃদয় এবং যোগায় গৌরব ও বিশ্বাসের প্রাণ। এটা নিশ্চয়ই ইসলামের শক্তি ও অলৌকিকতা। এবং তা বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে ইসলাম ধর্মের সামর্থ্যেরই প্রমাণ বহন

---

১. সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্পর্কেও তাঁর রচিত সুন্দর একটি গ্রন্থ রয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব হচ্ছেন সেই মুসলিম বাদশাহ যাকে কেন্দ্র করে ভীষণ তর্ক-বিতর্কের জন্ম দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহলে এবং ইংরেজ ও হিন্দু ইতিহাসবিদদের বই-পুস্তকসমূহে যাকে অপবাদ ও আক্রমণের টার্গেট করা হয়েছে। প্রফেসর ফারুকী রচিত গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে 'আওরঙ্গজেব ও তাঁর যুগ' (Aurangzeb & His Age)।

২. 'ইসলামী চিন্তা ও তার উৎস' (Muslim Thougt & Source) শিরোনামে তার একটি গ্রন্থ রয়েছে।

করে। আমাদের উদ্দিষ্ট সেই লেখক হচ্ছেন মুহাম্মদ আসাদ যাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে 'লিওপোল্ড ওয়েইস' (Leopold Weis) নামে সবাই জানত। তিনি ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত একজন জার্মান নাগরিক। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আল ইসলাম আলা মুফতারাকিত তুরুক' (Islam At The Cross Roads) শুধুমাত্র এশিয়ায় নয়; বরং গোটা মুসলিম বিশ্বে চিন্তার জাগৃতি ঘটিয়েছে, রূহ ফুঁকে দিয়েছে বিশ্বাস ও আস্থার। এ গ্রন্থটি সুন্নাতে নববী এবং ইসলামী সভ্যতার যেভাবে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা করেছে, দীর্ঘকাল ধরে অন্য কোনো লেখক বা অন্য কোনো গ্রন্থ এরকম প্রতিরক্ষা করেছে বলে আমাদের জানা নেই।

অনুরূপভাবে, এরকম কোনো ইউরোপিয়ান লেখককেও আমরা খুঁজে পাই না– যিনি এই ধরণের সূক্ষ্ম, সবিস্তারে ও স্পষ্টভাবে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যকার পার্থক্যসূচক দিকগুলোর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং দলিল-প্রমাণসহ পাশ্চাত্য সভ্যতার এমন কঠোর-কঠিন সমালোচনা করেছেন যেভাবে করেছেন– লেখক মুহাম্মদ আসাদ। ভারত অবস্থানকালে মুহাম্মদ আসাদ আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি 'আল ইসলাম আলা মুফতারাকিত তুরুক' শিরোনামে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করেন প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক জনাব উমর ফাররূখ। এর বেশকিছু সংস্করণ ইতোমধ্যে বের হয়ে গেছে।

এই লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে (Road to Mecca)। এ গ্রন্থটিও ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যাপকভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হয়। পঠিত হয় অত্যন্ত আগ্রহের সাথে। এতে সম্মানিত লেখক অত্যন্ত পান্ডিত্য ও পারদর্শিতার সাথে ইসলামের মাহাত্ম্য ও ব্যাপকতা এবং ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া লেখক গ্রন্থটিতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সমাজব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ ও জাযিরাতুল আরবের সূক্ষ্ম চিত্রায়নের মাধ্যমে আমেরিকা ও ইউরোপীয়দের মন-মস্তিস্কে ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সফল প্রচেষ্টা চালান। আর এর সবই করেছেন আরবের মরুভূমি সফরকালে এবং সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে, যে পেশার জন্যে লেখক সেই দীর্ঘ ভয়ঙ্কর সফরের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এসবই বর্ণিত হয়েছে লেখকের উন্নত ভাষার চমৎকার নান্দনিক আবরণে। গ্রন্থটি 'আত-তরীকু ইলা মক্কা' শিরোনামে আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এই লেখকের অনুমোদনক্রমে গ্রন্থটি উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন ইসলামী দাওয়াতের সিপাহসালার মরহুম জনাব মুহাম্মদ আল হাসানী– যা লাখনৌস্থ

'আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১] পরে হিন্দী ভাষায়ও গ্রন্থটির অনূদিত সংস্করণ বের হয়।

ইংরেজি ভাষায় ইসলামী গ্রন্থরচনার আলোচনা করতে গেলে নওমুসলিম লেখিকা মরিয়ম জামীলা বিরচিত ইসলামী বিষয়াদিকে কোনো মতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি একজন সুশিক্ষিতা মার্কিন মহিলা। বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী তিনি। ইসলামে সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার পূর্বে তিনি 'মার্গারেট মার্কাস' (Margaret Marcus) নামে পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে এক গভীর গবেষণা এবং সেই সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিকে কেন্দ্র করে তাঁর রচনাগুলো তৈরি হয়, তাঁর লেখা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্যাপক এক বিদ্রোহ। মরিয়ম জামীলার (Islam Versus the West) তথা 'পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম' ও (Islam & Modernism) তথা 'ইসলাম ও আধুনিকতা' গ্রন্থ দু'টি মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা এবং দৃষ্টির গভীরতার বৈশিষ্ট্যেমন্ডিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। এসব গ্রন্থে সঠিক ইসলামী বোধ, পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনায় চিন্তার স্বাধীনতা এবং আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যকরণে পরিচালিত আন্দোলনসমূহের নির্মোহ মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা একাডেমি : পরিচয় ও ফসল

যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমি বয়সের তুলনায় নিতান্ত নবীন আর ফসলের বিচারে সর্বাধিক (বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায়) সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভারতের লাখনৌস্থ নাদওয়াতুল উলামায় অবস্থিত 'ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা একাডেমি[২]। একাডেমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ ইং সালে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে ইসলামের যোগ্যতা ও উপযোগিতার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা। এ বিশ্বাস পুন:প্রতিষ্ঠার জন্যে যে, ইসলাম কেবল মাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে আসেনি কিংবা অন্যান্য ধর্মের মত যুগে যুগে শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকার জন্যে নয়; বরং ইসলাম এসেছে পৃথিবীর মানব সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে, সমসাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে। একই সাথে ইসলামের বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, তাঁর সীরাত, আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি এমন নতুন শক্তিশালী ঈমান সৃষ্টি করা যে, তিনিই সর্বশেষ রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ও সকল সরল পথের একমাত্র

---

১. গ্রন্থটি এ লেখকের একটি ভূমিকাসহ 'তুফান সে সাহিল তক' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

২. একাডেমির ইংরেজি নাম হচ্ছে (The Academy of Islamic Research & Publication)।

দিশারী। এছাড়া এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার পেছনে আরো উদ্দেশ্য ছিল, এখান থেকে এমন তুলনামূলক পর্যালোচনা, জ্ঞাননির্ভর গবেষণাকর্ম বের করা হবে যাতে একদিকে ইসলামের সঠিক পরিচয় যেমন থাকবে, পাশাপাশি তা নতুন নতুন বিবেককে সন্তুষ্টও করতে সক্ষম হবে। প্রথম প্রথম একাডেমিটি চালু হয় ছোট্ট একটি বীজ আকারে, অত্যন্ত সীমিত সম্বল নিয়ে– যা এধরণের একটি বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। অথচ এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পচিশ বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে এই একাডেমি থেকে বিভিন্ন ভাষায় ১৫৫ টি বই-পুস্তক ও গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজি ভাষায় পঞ্চাশটি, ষাটটির বেশি উর্দুতে, সাঁইত্রিশটি আরবি ভাষায় আর ছয়টি হিন্দিভাষায়।

আলোচিত গবেষণা একাডেমির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহের অন্যতম হচ্ছে, এ প্রবন্ধকারের লেখা 'আস সীরাতুন ন্যাবিবিয়্যা' গ্রন্থের (Mohammad Rasulullah) শীর্ষক ইংরেজি অনুবাদ, পবিত্র কুরআন, হাদীস ও তুলনামূলক পর্যালোচনার আলোকে রচিত 'আল আরকানুল আরবাআ' গ্রন্থের (Four Pillars of Islam) শীর্ষক অনুবাদ, 'মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব' গ্রন্থের (Western Civilization, Islam and Muslims) শীর্ষক অনুবাদ, 'ঈমান ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থের (Faith Versus Materialism) শীর্ষক অনুবাদ, 'বাইনাদ দীন ওয়াল মাদানিয়া' গ্রন্থের (Religion & Civilization) শীর্ষক অনুবাদ, 'মা যা খাসিরাল আলামু বিন হিতাতিল মুসলিমীন' তথা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' নামক গ্রন্থের (Islam & the World) শীর্ষক অনুবাদ, 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' সিরিজ গ্রন্থের (Saviours of Islamic Spirit) শীর্ষক অনুবাদ (১-৭), 'কাদিয়ানী ও কাদিয়ানী মতবাদ' গ্রন্থের (Qadianism: a Critical Study) শীর্ষক অনুবাদ এবং 'নাযরাতুন আলা হায়াতিল মুসলিম' গ্রন্থের (The Musalman) শীর্ষক অনুবাদ।

উপরোল্লিখিত সবগুলো গ্রন্থই এই প্রবন্ধকারের লেখা। অন্যদের লিখিত যেসব বই-পুস্তক ও গ্রন্থ একাডেমি প্রকাশ করেছে– তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী রচিত 'খুতবাতে মাদ্রাজ' তথা 'মুহাম্মদী পয়গাম' নামক বইয়ের (Muhammad-The Ideal Prophet) শীর্ষক ইংরেজি অনুবাদ, সায়্যিদ আতহার হুসাইন কর্তৃক খুলাফায়ে রাশিদীন সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের (The Glorious Caliphate) শীর্ষক অনুবাদ, 'আল ফুরকান'

ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি বিরচিত সিরিজ বই 'হাদীসের অর্থ ও পয়গাম' এর (Meening and Message of the Traditions) শীর্ষক অনুবাদ, 'ইসলাম কী?' বইয়ের (What Islam is?) শীর্ষক অনুবাদ, 'দ্বীন ও শরীয়ত' বইয়ের (Islam, Faith and Practice) শীর্ষক অনুবাদ, 'কুরআন কী বলে' বইয়ের (The Quran and You) শীর্ষক অনুবাদ। এছাড়া রয়েছে সায়্যিদ আতহার হুসাইন রচিত 'কুরআনের পয়গাম' নামক গ্রন্থের (The Message of Quran) শীর্ষক ইংরেজি অনুবাদ।

এ গুলো ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে লিখিত বই-পুস্তকের হিসাবের বাইরে। যেমন (Glory of Iqbal) শিরোনামে 'রাওয়ায়ে ইকবাল' এর অনুবাদ, (India During Muslim Rule) শিরোনামে আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী রচিত 'ইসলামী যুগে ভারতবর্ষ' এর অনুবাদ, (Muslims in India) শিরোনামে 'ভারতীয় মুসলমান' এর অনুবাদ, সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর জীবনী ও তাঁর বিশাল জিহাদী ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের উপর জনাব মুহিউদ্দীনের লেখা গ্রন্থের (Saiyid Ahmad Shahid) শীর্ষক অনুবাদ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের ইংরেজি সংকলন যেমন 'পাশ্চাত্যের সাথে কিছু কথা' এর ইংরেজি অনুবাদ (Speaking Plainly to the West), আমেরিকার বুকে স্পষ্টকথা' এর ইংরেজি অনুবাদ (From The Depth of Heart in America)।

আমরা এখানে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বই-পুস্তক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর এসব বই-পুস্তকের অধিকাংশ বই যুগোপযোগী সাহিত্যপূর্ণ ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন ডঃ মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়াই ও জনাব মুহিউদ্দীন[১]। এর মধ্যেও সাহিত্য ও গবেষণাকর্মে ডঃ মুহাম্মদ আসিফের অবদান সবচেয়ে বেশি[২]। এসব বই ও অনুবাদকর্ম অসাধারণ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে দাওয়াত ও শিক্ষিতমহলে, সমাদৃত হয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা- তিন মহাদেশেই। মহাদেশগুলোতে এখনো চাহিদা রয়েছে এসব বইয়ের। পাঠকের এমন আগ্রহ– যা পূরণ করা সাধারণভাবে সীমিত সম্বলের একটি গবেষণা একাডেমির পক্ষে নিতান্তই কঠিন কাজ ছিল।

---

১. তবে 'কাদিয়ানীবাদ' (Qadianism) বইটি ডঃ যফর ইসহাক আনসারী কর্তৃক অনূদিত।

২. ইংরেজি ভাষার কোনো কোনো সাহিত্যিক আমাকে বলেছেন, 'মা যা খাসিরাল আলামু বিন হিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থের অনুবাদটি অনুবাদ সাহিত্যের একটি চমৎকার ও অদ্বিতীয় উদাহরণ।

উর্দুভাষায় রচিত বৃহদাকারের ইলমি গবেষণাকর্ম :

এ যাবত যা আলোচনা করলাম, তা ছিল বিংশ শতাব্দিতে ইলমি ও ইসলামী বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় রচিত একাডেমিক ও গবেষণাকর্মের একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ, যার প্রায় সবটাই অথবা অধিকাংশই প্রকাশিত হয় ভারতীয় উপমহাদেশে দেশবিভক্তির পূর্বে। বিভক্তির পর খুব সামান্যই রচিত হয়েছে।

আমরা যদি ইংরেজি ভাষার সীমা অতিক্রম করে এ প্রসঙ্গে অন্য কোনো ভাষাকে বিবেচনায় নেই তাহলে উর্দুভাষাকে নিতে পারি। কারণ, উর্দু হচ্ছে ইংরেজি ভাষার পর যুগ যুগ ধরে প্রচলিত উন্নত ও গবেষণাধর্মী দ্বিতীয় ভাষা এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে লেখালেখি ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ভাষা। এছাড়া উর্দু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহুল প্রচলিত অন্যতম ভাষা যাতে এক বিরাট সংখ্যক আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও লেখাপড়া ও ভাব বিনিময় করে থাকে।

সুতরাং, মানতেই হবে এবং আগামী প্রজন্ম ও ইতিহাসের জন্যে রেকর্ড করে নেয়া জরুরি যে, মুসলিম বিশ্বে যেসব ভাষার প্রচলন রয়েছে, তার মধ্যে বিষয়ের বিশালতা ও ইলমি মূল্যায়নের বিচারে গভীর সযত্ন অধ্যয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত সব চাইতে বেশি ও ব্যাপক আকারের মৌলিক গবেষণাকর্ম প্রণীত হয় এই উর্দু ভাষায়। প্রাচ্যের বিভিন্ন আরবি দ্বীনি (ব্যাপক অর্থে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা হতে শিক্ষা সমাপ্ত করেন যেসব আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি তাদেরই মূল ভূমিকা রয়েছে এই ইসলামী সচেতনতা, চিন্তা তৎপরতা ও আধ্যাত্মিক জিহাদের ক্ষেত্রে। কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া মুসলিম যুবকেরা আধুনিক যুগে যেসব মানসিক অস্থিরতা ও চিন্তার সংকটে ভোগে, সেক্ষেত্রে শেষোক্ত এই আধ্যাত্মিক জিহাদ কখনো কখনো সময়ের শ্রেষ্ঠ জিহাদে পরিণত হয়।

ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া যুবসমাজ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তার দিক দিয়ে– যা কখনো কখনো আক্বীদা-বিশ্বাসগতভাবেও ঘটে থাকে- আজ যে ধর্মত্যাগ তথা মুরতাদ হওয়ার শিকার, সে ক্ষেত্রে চিন্তাগত ও গবেষণাধর্মী এ কর্মটি উত্তম জিহাদ হিসেবে বিবেচিত। আমরা এ কথা বলছি সুক্ষ্ম, নিরেপক্ষ ও তুলনামূলক অধ্যয়নের আলোকে এবং বাস্তবতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই।

আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ), আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহঃ) এবং 'দারুল মুসান্নিফীন' :

আমার জন্যে সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানে বসে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে যাচ্ছি, যার প্রাঙ্গণে আজ আমরা সবাই মিলিত হয়েছি, যেখানে এই আন্তর্জাতিক গবেষণা সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে.. সেই 'দারুল মুসান্নিফীন'-এ বসে অত্যন্ত সৌভাগ্যের সাথে বলছি, এই প্রতিষ্ঠানের মহান প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর সুযোগ্য সঙ্গী-সাথী ও তাঁর কৃতী শিষ্যরাই এই আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবার আগে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবার জন্যে আহ্বান করেন। রীতিমত কাজ শুরু করেন। (আমার জানা মতে,) এই 'দারুল মুসান্নিফীন'ই মুসলিম বিশ্বের প্রথম জাতীয় ইলমি ও গবেষণা একাডেমি– যা প্রাচ্যবিদদের উত্তেজক লেখাসমূহ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের বিপদ মোকাবেলার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাশাপাশি, ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজকে আশ্বস্তকরণ, শেষ নবীর মহান ব্যক্তিত্ব ও সীরাত, মহানবীর ছায়াতলে প্রতিপালিত প্রজন্ম তথা সাহাবাদের পরিচয় এবং ইসলামের জ্ঞান ও ইলমি সম্পদের সঠিক মূল্য তাদের সামনে তুলে ধরার জন্যে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রয়োজন হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে মিসর থেকে যখন প্রফেসর জুরজি যায়দান তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তারীখ আত-তামদ্দুন আল-ইসলামী' (ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস) প্রকাশ করেন, তখন শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের মহলে গ্রন্থটি খুব আলোচিত হয়। কিন্তু বিষয়ের বিশালতা ও তথ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও- গ্রন্থটিতে উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগের খলীফাদের প্রতি জুলুম করা হয়, ঐতিহাসিক কিছু কিছু বাস্তবতার বিকৃতি রয়েছে এবং আলেজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী অগ্নিকান্ডের মনগড়া কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। এতে আল্লামা শিবলি নোমানির মধ্যে ইসলামী জোস ও জযবা জেগে উঠে। ফলে তাঁর প্রতি গ্রন্থকারের প্রশংসা, তাঁকে নিয়ে সুন্দর আলোচনা[১] এবং তাঁর ও গ্রন্থকারের মধ্যকার জায়গার দূরত্ব কিছুই তাঁকে ঐ গ্রন্থের গবেষণাধর্মী সমালোচনা করা থেকে বাধাগ্রস্ত করেনি। সম্পূর্ণ দলিল ও তথ্যভিত্তিক সমালোচনা করে তিনি গ্রন্থটির একটি জবাবী গ্রন্থ রচনা করেন,

---

১. 'তারীখ আত-তামদ্দুন আল-ইসলামী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃষ্ঠাঃ ২৬০

'আল-ইনতিকাদ আলাত তামাদ্দুনিল ইসলামী' (ইসলামী তামাদ্দুন শীর্ষক গ্রন্থের সমালোচনা) শিরোনামে। আল্লামার সমালোচনামূলক গ্রন্থটি আরবি ভাষায় ১৯১২ ইং সালে প্রকাশিত হয় এবং তা মিসর ও ভারতে শিক্ষিত ও ইসলামপ্রিয় মহলে অত্যন্ত প্রশংসার সাথে গৃহীত ও সমাদৃত হয়।[১]

আল্লামা শিবলির এই রচনামূলক প্রতিষ্ঠান তথা 'স্কুল অব থট' (School of Thought) তত্ত্ব ও গবেষণার জগতে বেশ কিছু চমৎকার চমৎকার নিদর্শন রেখে গেছে। জ্ঞান ও তথ্যের প্রাচুর্যের পাশাপাশি পরিশ্রমী অধ্যয়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্যতা, সুবিবেচনা ও সুচিন্তা এবং গভীর মনোযোগ ও মনোনিবেশের ক্ষেত্রে এমন এমন সব চিহ্ন রেখে গেছে, যেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে ইসলামের প্রাথমিক স্টাডি ও গবেষণার সাথে। ঐ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষা হাসিল করেন, তাদেরই অগ্রনী ভূমিকা রয়েছে এ ক্ষেত্রে। কারণ, তারাই প্রথমে এগিয়ে আসেন এ গবেষণাকর্মে।

এ ক্ষেত্রে তারা এমন সব ভাষাগত পদ্ধতি, সাহিত্য ও বর্ণনাশৈলী চয়ন করেন– যা আধুনিক সিরিয়াস গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য। পাশাপাশি তার মধ্যে রচনার মাধুর্য্য ও সাহিত্যের স্বাদও অনুভূত হয়- তাও আবার সঠিক পরিমাণে ও সংগত মাত্রায়- যা সমসাময়িক যুবসমাজ ও আধুনিক প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার জন্যে অপরিহার্য। বিশেষ করে, যারা সাহিত্যের পরিমন্ডলে বেড়ে উঠে, লালিত পালিত হয় এমন পরিবেশে যা পরিচ্ছন্ন ভাষার প্রতি আসক্ত। যে পরিবেশ বর্ণনা পদ্ধতিকে উপরোক্ত সেই ধরণের ঐতিহাসিক গবেষণাধর্মী কর্মে পরিণত করতে অভ্যস্ত।

মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী যারা সমসাময়িক পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠে- দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় ও আক্বীদা, ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মুসলমানদের উজ্জ্বল ইতিহাস, মুসলমানদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে 'দারুল মুসান্নিফীন'এর গড়া শাগরেদদের লেখা বই-পুস্তকের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাদের রচনাসমূহ মুসলমানদের আত্মগৌরব ও আত্মবিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করতে এবং সেই বিশেষ 'হীনমন্যতা' দূর করতে বিরাট প্রভাব রেখেছিল– যা তৎকালিন মুসলমানদের মধ্যে ১৮৫৭ সালের পরাজয়ের কারণে সৃষ্টি হয় এবং যার ভিত্তিকে আরো মজবুত করে পরবর্তী পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ।

১. গ্রন্থটি ভারতের লাখনৌস্থ এশীয় প্রেস থেকে পাথুরে মুদ্রণে বৃহদাকারে প্রকাশিত হয়।

এছাড়া তাদের রচনাসমূহ মৌলিকত্ব ও পরিচ্ছন্নতার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। সেই 'গোঁড়ামি ও ভুল বোঝাবুঝির ত্রুটি থেকে অনেকাংশে মুক্ত– যা জন্ম নিয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ অধ্যয়ন থেকে। তাদের রচনাগুলো সেসব তথ্য থেকেও মুক্ত– যা পরোক্ষভাবে ও অন্যের মাধ্যমে অর্জিত। এ কারণেই সেই বিশেষ গোঁড়ামি, বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন প্রাচ্যবিদগণ, ইউরোপের জ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাদের শিষ্য-শাগরেদরা। এখনো হচ্ছেন...। আর আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় দক্ষতা, সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন, মৌলিক ইসলামী তথ্যভান্ডার ও উৎসসমূহ সম্পর্কে সরাসরি অবগতি, যখন যা ইচ্ছা সেসব জ্ঞানের উৎস থেকে সরাসরি গ্রহণ করা এবং উপকৃত হবার সক্ষমতার কারণেই 'দারুল মুসান্নিফীন'এর পরিবেশে বেড়ে উঠা এসব আলেম ও রচয়িতাদের রচনাসমগ্রে মৌলিকত্ব রয়েছে, তাদের লেখাগুলো হয়েছে গোঁড়ামি ও ভ্রান্তিমুক্ত।

'দারুল মুসান্নিফীন' প্রকল্পের চিন্তানায়ক আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ)-এর অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সীরাত রচনা যা তিনি আধুনিক ও প্রাচীনকালের সীরাত রচয়িতাদের তুলনায় বিস্তর পরিসরে, আরো বিশাল ও পরিপূর্ণ চিন্তাধারায় আরম্ভ করেন। এ সীরাতগ্রন্থটিকে পরে আরো বিস্তৃত ও বৃহদাকার দান করেন তাঁরই যোগ্য শাগরেদ ও কৃতী খলীফা আল্লামা ডঃ সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (রহঃ)। তিনি সাত খন্ডে সম্পূর্ণ করেন এ সীরাতগ্রন্থ। আলোচ্য সীরাত সিরিজের প্রথম খন্ডের পুরোটি প্রণীত হয়েছে আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ) এর কলমে। দ্বিতীয় খন্ডের মধ্যে কিছু সংযোজন রয়েছে তাঁর শিষ্য আল্লামা সায়্যিদ নদভী (রহঃ) এর পক্ষ থেকে। বাকি খন্ডগুলো সব এ যোগ্য শিষ্যের স্রোতস্বিনী কলম ও প্রবহমান বর্ণনায় রচিত।

পরবর্তী খন্ডসমূহের বিবরণ অনেকটা এরকম, তৃতীয় খন্ড হচ্ছে বিভিন্ন প্রমাণাদি ও মু'যিজা সম্পর্কিত। চতুর্থ খন্ড নবুয়তের মানছাব ও পদবী নিয়ে। এতে বিস্তারিতভাবে নবুয়তি মানছাবের বাস্তবতা, এর বৈশিষ্ট্যাবলি, আবির্ভাবের সময়কার সভ্য দুনিয়া ও আরব উপদ্বীপের বাস্তব অবস্থা এবং ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। পঞ্চম খন্ড শারীরিক, আর্থিক ও আত্মিক বিভিন্ন ইবাদাত সম্পর্কিত। ষষ্ঠ খন্ড ইসলামে নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রের দর্শনের উপর পরিব্যপ্ত। এ খন্ডে সেসব গবেষণা রয়েছে– যা এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সর্বশেষ সপ্তম খন্ডটিতে বিভিন্ন আচার-আচরণ, মু'আমালা, লেন-দেন, কাজ-কারবার এবং রাজনীতি বিষয়ে গবেষণা

তুলে ধরা হয়। এভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি সীরাত, সীরাতের শিক্ষা ও প্রভাবের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বকোষে পরিণত হয়।

আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ) এর অনবদ্য কৃতিত্বসমূহের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর জীবন চরিত নিয়ে রচিত তার 'আল ফারূক' শীর্ষক গ্রন্থ, যা চিরন্তন সাহিত্য নিদর্শন এবং শক্তিশালী অলংকারপূর্ণ রচনাশৈলীর এক উপমা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যে গ্রন্থটি পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত আধুনিক অনেক মুসলিম যুবসমাজের অন্তরে ইসলামের ভালবাসা ও ঈমানের বীজ বপন করে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণের মোকাবেলায় তাদেরকে পাহাড়ের মত অটল থাকতে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ দেয়। এ গ্রন্থটি তাদের সামনে যুগোপযোগী উন্নত এক আদর্শ উপস্থাপন করে।

মহাপুরুষদের জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ) ছিলেন এক অনুকরণীয় উদাহরণ– যা তিনি প্রমাণ করেন তার রচিত 'আল-গাজ্জালী' (ইমাম গাজ্জালীর জীবনী), 'জালালুদ্দীন রূমী' (আল্লামা রূমীর জীবনী), 'আল-মামূন' (আব্বাসীয় খলীফা আব্দুল্লাহ আল মামূনের জীবনী), 'আল ইমাম আবূ হানীফা আন নু'মান' [ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর জীবনী] ইত্যাদি গ্রন্থে। যে ইসলামী ইতিহাস প্রায় পরিত্যক্ত অথবা বড় বড় বালামগুলোর ভেতরে মৃত অবস্থায় পড়া ছিল, তার শিষ্যগণ সেই ইতিহাসকে যুগোপযোগী রচনাশৈলী এবং আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির সাথে মিল রেখে নতুনভাবে রচনা করেন। 'উসওয়াতুস সাহাবা' (সাহাবীদের আদর্শ), 'সিয়ারুল মুহাজিরীন' (মুহাজিরদের জীবনচরিত), 'সিয়ারুল আনসার' (আনসারদের জীবনচরিত), 'সিয়রুত তাবিয়ীন' (তাবিয়ীদের জীবনচরিত) ইত্যাদি গ্রন্থে তাদের সেই যোগ্যতা প্রতীয়মান হয়।

কোনো কোনো গবেষণাকর্ম ও মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যেই সেই কর্ম বা গ্রন্থের মূল্য প্রতিভাত হয়ে থাকে। সম্মৃদ্ধ হয় এমনসব শক্তিশালী বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণনির্ভর তথ্য দ্বারা– যা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার কাঠামোর উপরই গঠিত এবং যা প্রোজ্জ্বল দলিল, উদাহরণ ও তত্ত্বের আলোকেই বিরচিত। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায়, ফার্সি কাব্যের ইতিহাস, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এবং ইরানের কবিদের জীবনচরিত নিয়ে রচিত আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ) এর গ্রন্থ 'শি'রুল আজম' এবং তাঁর অন্য দু'গ্রন্থ 'আল জিয্য়া ফিল ইসলাম' ও 'হুকুকুয যিম্মিয়ীন' যাতে জিযয়ার (তথা ইসলামী রাষ্ট্রে

বসবাসরত অমুসলিমদের উপর আরোপিত কর বা ট্যাক্স)- ইসলামী বাস্তবতা এবং ইসলামে জিম্মীদের (তথা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম)- অধিকার ও দায়িত্বসমূহ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। এছাড়া, আল্লামার আরো দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ 'মাকতাবাতুল আসকান্দারিয়া' (আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী) ও 'নাযরাতুন আলা আওরঙ্গযেব আলমগীর' (আওঙ্গযেব আলমগীরের প্রতি এক নজর) যে গ্রন্থদ্বয়ে সাধারণ ও বিশেষমহলে প্রচলিত অপবাদগুলোর অপনোদন করা হয়েছে এবং যে গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে অনেক পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক বাস্তবতার[১] উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে.......... এসব গ্রন্থ বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন, জ্ঞানভিত্তিক সমালোচনা ও ইতিহাস রচনার উন্নততর নমুনা হিসেবে গণ্য করা যায়।

তারপর আসে আল্লামা শিবলি নোমানি (রহঃ) এর সবচাইতে প্রতিভাবান শিষ্য এবং নাদওয়াতুল উলামার অন্যতম কৃতিসন্তান আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (রহঃ)-এর পালা। তিনি রচনা করেন 'আরদুল কুরআন' শীর্ষক গ্রন্থ। এটা হচ্ছে কুরআনের যুগ ও নবুয়তের জমিন তথা নবুয়ত অবতীর্ণের স্থানবিষয়ক ভূতত্ত্বের উপর প্রাচ্যের কোনো ইসলামী ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস, তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, আরব দ্বীপ অভিমুখে কিংবা আরব দ্বীপ হতে অন্যত্র তাদের হিজরতের ধারা, আরবদের ভাষা, ধর্ম, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাদের সভ্যতার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯১৫ ইং সালে এ গ্রন্থটি রচনা করেন লেখক এবং এ গ্রন্থ রচনায় তিনি প্রচুর পরিমাণ বিদেশী বিভিন্ন তথ্যসূত্র হতে উপকৃত হন। 'আরব ও হিন্দ কী তাআল্লুক্বাত' (আরব-ভারত সম্পর্ক), 'আরব্ কী জাহাজ রা নি' (আরবের নৌবিদ্যা) এবং 'খৈয়্যাম' ইত্যাদি গ্রন্থগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম গবেষণা, বিস্তর অধ্যয়ন, সমৃদ্ধ ইসলামী পাঠাগারে গভীর নিমগ্নতা, জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি নজিরবিহীন অনুরাগ, জ্ঞান ও শিক্ষা হাসিলের অদম্য ইচ্ছা এবং সুগভীর ও বিস্তর তথ্যের নির্দশন। এছাড়া, উল্লেখিত গ্রন্থগুলো এমন উন্নত সাহিত্য ও জ্ঞানের নমুনা– যা নিয়ে উর্দুভাষা ও নব প্রজন্ম উভয়ই গর্ব করতে পারে।

---

১. উনবিংশ শতাব্দির শেষে এবং বিংশ শতাব্দির শুরুতে ইসলামী দেশসমূহে যখন ইউরোপিয়ানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইতিহাস বিষয়টিই ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের সভ্যতা, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ইসলামী শাসনাধীনে যারা ছিল তাদের প্রতি ইসলামের ব্যবহার সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির এক প্রশস্থ সদর দরজায় পরিণত হয়। ফলে, সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন, ইসলাম নিয়ে সৃষ্ট যাবতীয় সন্দেহের দাঁতভাঙ্গা জবাব এবং সব অপবাদ অপনোদন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

'উমর খৈয়্যাম' ছিলেন ইরানের গৌরব। ইরানের প্রথিতযশা কবি এবং গণিতশাস্ত্রে যে কয়েকজন সেরা বিদ্বান ছিলেন তাদের অন্যতম। কিন্তু ইরান এতবড় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বের নানা দিক উন্মোচনে ছোট কিংবা বৃহদাকারে আল্লামা সুলায়মান (রহঃ) বিরচিত গ্রন্থের মত আরেকটি গ্রন্থ রচনা করতে পারে নি।

তাঁর 'খুতবাতে মাদ্রাজ' শীর্ষক বই যা আরবি ভাষায় 'আর রিসালাতুল মুহাম্মাদিয়্যা' শিরোনামে অনুদিত হয়েছে[১].... এই বইটি সীরাতে নববী ও মুহাম্মাদী পয়গাম নিয়ে এ পর্যন্ত যত বই-পুস্তক লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে হাতে গোনা যে কয়েকটি সবচাইতে শক্তিশালী, জোরালো, তথ্য-উপাত্তের দিক দিয়ে সবচাইতে বেশি সমৃদ্ধ এবং সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী যে বই রয়েছে সেসবের মধ্যে অন্যতম একটি বই। একইভাবে 'সীরাতে আয়েশা' শিরোনামে লেখা তাঁর বইটিও সংশ্লিষ্ট বিষয় তথা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর জীবন চরিত বিষয়ে চমৎকার একটি বই।

আল্লামা সুলায়মান নদভী অধ্যয়নের প্রাচুর্য্য, হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের জ্ঞান এবং মতানৈক্য রয়েছে এমন সব মাসআলার ক্ষেত্রে জমহূর (তথা সাধারণ আহলে সুন্নাত) যে মতটি গ্রহণ করেছেন, সেটাকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে কখনো কখনো তাঁর উস্তাদকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আসলে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র কিছু যোগ্যতা থাকে।

এ মহান প্রতিষ্ঠান (দারুল মুসান্নিফীন)-এর প্রাণপুরুষ ও কেন্দ্রবিন্দু আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর চারপাশে একগুচ্ছ ইসলামী লেখক ও গবেষক ইতিহাসবেত্তার সমাগম ঘটে। তাদের অধিকাংশই হলেন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষাসমাপনকারী। এ নদওয়াতুল উলামা তার কৃতী সন্তানদের দিয়ে সর্বদা এ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেছে এবং এখনো করছে। আমরা এখানে এই তাড়াহুড়োর মধ্যে যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে পারি, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, 'ওসওয়ায়ে সাহাবা' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা, সুযোগ্য লেখক ও গবেষক শায়খ আবদুস সালাম নদভী।[২] তাঁর এ গ্রন্থটি দ্বীনি ও জ্ঞানীমহলে খুবই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এছাড়া তিনি 'শি'রুল হিন্দ' (ভারতের কবিতা),

---

১. বইটি আরবিতে রূপান্তর করেন আমাদের বিজ্ঞ বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ নাজেম নদভী- যার বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছে আরব বিশ্বের বিভিন্ন শহর থেকে।

২. অনেক সমালোচক তাকে আল্লামা শিবলি নোমানির শিষ্যদের মধ্যে লেখার ধরণ, ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর ক্ষেত্রে স্বীয় উস্তাদের সাথে সবচাইতে বেশি সদৃশ বলে মনে করেন।

'হুকামা-উল ইসলাম' (ইসলামের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) ইত্যাদি গ্রন্থেরও প্রণেতা। তাদের মধ্যে আরেকজন হচ্ছেন হায়দারাবাদস্থ উসমানিয়া ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক, প্রখ্যাত আলেম শায়খ আবদুল বারী নদভী। যিনি যুক্তিবিদ্যা ও আধুনিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.) এর মু'জিযাসমূহ নিয়ে মূল্যবান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ তৈরি করেন– যা পরে 'সীরাতুন্নবী'র তৃতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত করা হয়। পাশাপাশি জনাব আবদুল বারী নদভী 'বাইনাদ দীন ওয়াল আক্বল'[১] ও 'বাইনাদ দীন ওয়াল ইলম'[২] শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ও রচনা করেন।

এছাড়া আরো আছেন– বিজ্ঞ উস্তাদ আলহাজ্ব মুঈন উদ্দিন নদভী, সমালোচক, সাহিত্যিক, লেখক ও কৃতী ইতিহাসবিদ শায়খ মুঈন উদ্দিন আহমদ নদভী, গবেষক সায়্যিদ রিয়াসত আলী নদভী, উস্তাদ সায়্যিদ নজিব আশরাফ নদভী, শায়খ সাঈদ আল আনসারী, শায়খ আবদুস সালাম ক্বিদওয়ায়ী নদভী, উস্তাদ মুজিবুল্লাহ নদভী, উস্তাদ জিয়া উদ্দিন ইসলাহি এবং দারুল মুসান্নিফীনের (তৎকালীন) বর্তমান পরিচালক, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও একজন বড় মাপের লেখক সায়্যিদ সাবাহ উদ্দিন আবদুর রহমান। তিনি একই সাথে 'আল মাআরিফ' ম্যাগাজিনেরও সম্পাদক। ভারতীয় উপমহাদেশের এক স্বনামধন্য ইলমি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত উক্ত ম্যাগাজিনটি যুগ যুগ ধরে জ্ঞান ও গবেষণামূলক ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে সবচাইতে উন্নতমানের ম্যাগাজিন হিসেবে বিবেচিত। এ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গবেষণা কর্মগুলো জ্ঞানীমহলে ব্যাপক সমাদৃত।

দিল্লীস্থ নদওয়াতুল মুসান্নিফীন :

'দারুল মুসান্নিফীন' (যা ১৯১৪ইং সালে প্রতিষ্ঠিত)-এর পর 'নদওয়াতুল মুসান্নিফীন' নামে আরেকটি ইলমি প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুফতি আতিকুর রহমান উসমানি এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ ইং সালে। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চিন্তানায়ক এবং এর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচাইতে বেশি, তাদের অন্যতম ছিলেন জমিয়তুল উলামার প্রাক্তন সচিব, মুসলিম নেতা ও মর্দে মুজাহিদ মরহুম হিফজুর রহমান। এ নদওয়াতুল মুসান্নিফীন থেকে 'বুরহান' নামে গবেষণামূলক একটি মাসিক পত্রিকা

১. গ্রন্থটির উর্দু নাম হচ্ছে 'মাযহাব ও আক্বলিয়্যাত' এবং তা আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন মাওলানা ওয়াজেহ রশীদ নদভী 'বাইনাদ দীন ওয়াল আক্বল' শিরোনামে।

২. গ্রন্থটির উর্দু নাম হচ্ছে 'মাযহাব ও সাইন্স' এবং তা নদওয়াতুল উলামাস্থ ইসলামি গবেষণা ও প্রকাশনা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক সাঈদ আহমদ আকবরাবাদি। এছাড়া, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের এমন আরো অনেক মূল্যবান প্রকাশনা রয়েছে– যা ইসলামী ও জ্ঞানী মহলে খুবই সমাদৃত। কুরআন, হাদীস, সুন্নাহ, শিক্ষা-তরবিয়ত, নীতি-নৈতিকতা, ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দেশের ইতিহাস, ফিকহের ইতিহাস, ভারতের ইসলামী তাসাওফের ইতিহাস এবং এ ক্ষেত্রে যারা ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন– তাদের ইতিবৃত্ত, সীরাত ও জীবন-চরিত বিষয়ে এর প্রকাশিত বই-পুস্তকের সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে[১]। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক বই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরল মূল্যবান গবেষণাধর্মী এবং উঁচু মাপের বিশ্লেষনমূলক কর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়।

অন্যান্য লেখক ও গবেষক :

বিশাল এ দুই ইলমি প্রতিষ্ঠানের বাইরেও কোনো কোনো লেখক ও গবেষকের নাম লেখালেখির জগতে চমক সৃষ্টি করেছে। যাদের কলম থেকে মহা মূল্যবান সব বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এর মধ্যে যারা খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন- প্রখ্যাত মুসলিম নেতা, ভারতের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, 'তরজমানুল কুরআন' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের অর্থকে উর্দুভাষায় রূপান্তরকারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। আলোচ্য পবিত্র কুরআনের অর্থের সাথে সাথে তিনি সেখানে বেশকিছু মূল্যবান সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী টীকা-টিপ্পনী সংযোগ করেন। গ্রন্থটি যদিও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি, এতদসত্ত্বেও তা আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জোরদার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও কুরআনের মু'যিযা স্বীকার করার কাছে নিয়ে আসে।

এটা অবশ্যই ওই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত উন্নত মানের সাহিত্যমাত্রা এবং শক্তিশালী অলঙ্কারপূর্ণ লিখনশৈলীর কারণেই। আরো আছেন 'আন্নাবিয়্যুল খাতম' (শেষ নবী), 'তাদবিনুল হাদীস' (হাদীসের সংকলন), 'আমাদের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি', 'ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা', 'ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানী। আছেন 'ইসলামী তাসাওফ' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক এবং কুরআন বিষয়ক অনেক

১. এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যেমন- মদিনা প্রবাসী এবং পরবর্তীতে মদিনায় সমাহিত প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা বদর আলম মিরাটি রচিত চার খন্ডের 'তরজুমানুস সুন্নাহ', মাওলানা হিফজুর রহমানের 'ক্বাসাসুল কুরআন', অধ্যাপক সাঈদ আহমদ আকবরাবাদি রচিত 'ইসলামে দাসপ্রথা' ও 'সিদ্দীকে আকবর', প্রফেসর খলীক আহমদ নেজামী বিরচিত 'তারিখে মাশায়েখে চিশত'।

লেকচার ও গবেষণা প্রবন্ধকার মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি, 'আসাহ্হুস সিয়র' (বিশুদ্ধতম সীরাত) ও 'ইসলাম ও নাগরিক বিষয়াদি' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক আল্লামা আবদুর রঊফ দানাপুরী, তৎকালীন ভারতের জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদী প্রমুখ।

মওদুদী সাহের বিরচিত 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' (ইসলামে জিহাদ) গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বের হয় 'দারুল মুসান্নিফীন থেকে ১৯৩০ ইং সালে। এছাড়া তিনি 'পর্দা', 'সূদ', 'তাফহীমুল কুরআন' শীর্ষক গ্রন্থসহ পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতি ও মূল্যবোধের সমালোচনামূলক বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেন– যা 'তানক্বীহাত' নামে প্রসিদ্ধ। ইসলামী বিষয়ে লিখিত তার প্রবন্ধগুচ্ছের নাম 'তাফহীমাত'। মওদুদী সাহেবের ইলমি লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি অপারগতা ও প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতির উপর আক্রমণাত্মক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিতেন। কিছু কিছু বিষয়ে এবং কোনো কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও এবং মতের এ ভিন্নতা যে কোনো যুগে যে কোনো স্থানে, যে কোনো আলেম ও গবেষকের সাথেই থাকতে পারে- তা সত্ত্বেও এখানে এই বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা জরুরি যে, মওদুদী সাহেবের প্রথম দিকের গবেষণা প্রবন্ধসমূহ যাতে তিনি উন্নত পর্যায়ে শক্তিশালী রচনাশৈলী দিয়ে আলোচনা করেছেন- যুগের সমস্যা ও ইসলামী সমাধান বিষয়ক তাঁর এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ তখনকার বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতার সম্মুখীন ইসলামী মহলে বেশ চর্চা করা হতো। যখন সর্বত্র পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত, তখন ইসলামের উপযোগিতা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর আস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তার আলোচ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, আরো আছেন 'ইসলামে দাসপ্রথা', 'সিদ্দীকে আকবর' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদি, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর খলীক আহমদ নেজামী, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ নজীর আহমদ, অধ্যাপক জিয়াউল হাসান ফারূকি ও ডঃ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী।

এগুলো ছাড়াও আরো এমন অনেক উদয়মান লেখক আছেন, গবেষণা ও লেখালেখির জগতে যাদের ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল। এখানে সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আর তাড়াহুড়ো, বিভিন্নতর চিন্তা ও ব্যস্ততার মধ্যে লিখিত এই প্রবন্ধটি সকল গবেষক ও লেখকের নামের তালিকাভিত্তিক কোনো সামগ্রিক দলিল নয়। এটা হচ্ছে– ভারতের ইলমি ও গবেষণা তৎপরতা, রচনা ও লেখালেখি বিষয়ক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মাত্র।

পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষা :

দুঃখিত, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইসলামী লেখকদের আলোচনা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে পারছি না।[১] ভারতীয় উপমহাদেশের আলোচনার মধ্যে তারাও শামিল। যদিও সময় ও স্থান এর বিশদ আলোচনার জন্য প্রযোজ্য নয়। তা সত্ত্বেও কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করতেই হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষের তত্ত্বাবধায়ক আল্লামা মুহাম্মদ শফি (রহঃ), সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি, 'আল কুরআন ওয়াল ইলমুল হাদীস' (কুরআন ও আধুনিক সাইয়েন্স) শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ মুহাম্মদ রফি' উদ্দিন[২], ইসলামী বিশ্বকোষের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ সায়্যিদ আবদুল্লাহ, উস্তাদ বজমি আনসারি, উস্তাদ মুহাম্মদ আসলাম, প্রচুর বই-পুস্তক ও গবেষণা প্রবন্ধের রচয়িতা শায়খ আবদুল কুদ্দুস আল হাশেমি, আল্লামা রহমতুল্লাহ কিরানভী কর্তৃক রচিত 'ইজহারুল হক'-এর অনুবাদকর্মের উপর লিখিত চমৎকার ভূমিকার লেখক মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানি, আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, উস্তাদ মুজহির উদ্দিন সিদ্দিকী ও প্রফেসর খুরশিদ আহমদ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার দু'টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। প্রথমতঃ লাহোরে ইসলামিক কাল্চারাল ফাউন্ডেশন'। দ্বিতীয়ত: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামাবাদ (Islamic Research Institute, Islamabad)। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ইসলামাবাদস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। এর বর্তমান (তখনকার সময় অনুপাতে) পরিচালক হচ্ছেন ডঃ আবদুল ওয়াহিদ হালি পূতা। এখান থেকে আরবি ভাষায় 'আল দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে এবং উর্দূ ভাষায় 'ফিকর ও নজর' নামে একটি করে ম্যাগাজিন বের হয়।

জ্ঞান-গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন মাদরাসা শিক্ষিতদের শ্রেষ্ঠত্ব :

এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, ভারতের আলেম-উলামা যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষা হাসিল করেন, তারা অন্য অনেক ইসলামী দেশের তুলনায় কিছু

---

১. বিশাল এই মুসলিম দেশে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, রচনা ও বই-পুস্তক, ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূক্ষ্ম অন্বেষণ ও সুবিস্তর তথ্য হাসিলের পথে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক কিছু বাঁধা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. ইংরেজি ভাষায় তাঁর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। একটি (Manifesto of Islam), আর দ্বিতীয়টি হচেছ (Ideology of Future)।

সময়ের জন্য হলেও জ্ঞান ও গবেষণার পথে পিছিয়ে ছিলেন না। স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে তাদের সম্পর্ক কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় নি। যেমনটি ঘটেছে অনেক মুসলিম ও আরব দেশে। ফলে, তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক মাঠে অগ্রণী ভূমিকার পাশাপাশি শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রগুলোতেও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

কাব্য, সমালোচনা ও সাহিত্যে তারা রেখে যান অনেক অবদান। যাতে তাদের উন্নত সাহিত্যরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ও সাহিত্যে তাদের রুচিবোধ এবং সাহিত্য সমালোচনায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতীয়মান হয় তাতে। এগুলোকে অর্বাচীনরা যতই প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করুক, বাস্তবে কিন্তু এগুলো একেকটা পথের মাইলফলক। যেমন, আলতাফ হুসাইন হালী বিরচিত 'মুক্বাদ্দামায়ে শি'র ওয়া শায়েরি' ও 'ইয়াদগারে গালিব', আল্লামা শিবলি নোমানি রচিত 'মুয়া যানায়ে আনীস ওয়া দবীর'[১] এবং তাঁরই সমসাময়িক সাথী নদওয়াতুল উলামার সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানি (রহঃ) কর্তৃক উর্দু ভাষার ইতিহাস ও উর্দু কবিদের জীবনচরিত সম্পর্কে রচিত 'গুলে রা'না'।

এছাড়া তার রচিত আরেকটি গ্রন্থ 'ইয়াদে আয়্যাম' শিরোনামে যা গুজরাট প্রদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাস, ইসলামী স্বর্ণ যুগে শিল্প, শিক্ষার ক্ষেত্রে গুজরাটের অগ্রযাত্রা এবং গুজরাটের উলামা, মাশায়েখ ও রাজা-বাদশাদের জীবনী সম্পর্কে লিখিত। এ গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচনাশৈলীর এক চমৎকার অনুকরণীয় নমুনা। গবেষণামূলক লেখালেখি ও ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখক ও ইতিহাসবিদদের এই নমুনাটি অনুসরণ করা উচিত। লেখক তাব 'গুলে রা'না' শীর্ষক গ্রন্থে মজাদার সব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়াদির অবতারণা করেন। সে সবের মাধ্যমে তিনি মূলত: প্রসিদ্ধ লেখক মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ রচিত 'আবে হায়াত'-এ বর্ণিত ঐতিহাসিক ভুল, উগ্র ও অদ্ভূত সব মতামতের উপর সমালোচনার করেন। সাহিত্যমহলে আযাদ সাহেবের এক ধরণের ঐন্দ্রজাল কাজ করতো– যার মোহে মানুষ তার বইয়ের সাহসী সমালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বেমালুম ভুলে যায়। এছাড়া আরো আছে মাওলানা আবদুস সালাম নদভী রচিত 'শি'রুল হিন্দ' (ভারতের কবিতা)। উল্লেখিত এসব গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞান ও গবেষণানামক শিকলের একেকটি স্বর্ণ কড়ি।

---

১. এ বইটি মূলত: সমসাময়িক দুই উর্দু কবি 'আনীস' ও 'দবীর'-এর মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা।

বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমালোচনার ক্ষেত্রে যত উন্নতিই সাধিত হোক, এ বিষয়ে যত প্রচেষ্টা ও যত পরিশ্রমই ব্যয় করা হোক- ভাষা ও সাহিত্যসেবায় এসব গুণী গবেষক ও লেখকদের রেখে যাওয়া অবদান আমরা কখনোই ভুলবো না। এক্ষেত্রে, তাদের একনিষ্ঠ মেহনত ও পরিশ্রমের প্রতি আমরা যুগ-যুগান্তরে ঋণী হয়ে থাকবো।

যেসব ব্যক্তি একেকটি গবেষণা একাডেমির ভূমিকা পালন করেছে :

ভারতে কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব এমনও অতিবাহিত হয়েছেন, যারা বড় বড় গবেষণা একাডেমি ও কমপ্লেক্স তাদের নিজস্ব সমৃদ্ধ পাঠাগার, পর্যাপ্ত মাধ্যম এবং লিখন ও প্রশাসনিক যন্ত্র দিয়ে যেসব রচনা, গ্রন্থের বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে থাকেন, তাঁরা একাই তা করে গেছেন। তা সম্ভব হয়েছে একান্ত ইলমি নিভৃতে, সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিমুখিতার মধ্যে এবং প্রচার-প্রচারণা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, নিরবে-নির্জনে। আর তাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন পরিবেশ যার মধ্যে এসব লেখক ও গ্রন্থ রচয়িতাগণ বেড়ে উঠেছেন, জীবন যাপন করেছেন, তা নিশ্চয়ই জ্ঞানের পথে মেহনত, ধৈর্য, পরিশ্রম ও কুরবানি এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশ ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাইতে বেশি সক্ষম ও উপযোগী ছিলো।

এসব ক্ষণজন্মা আলেম ও গ্রন্থকারের মধ্যে বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করতে পারি আল্লামা মাহমূদ হাসান খান টূনকীকে (মৃত্যু: ১৩৬৬ হিঃ) যিনি ৬০ খন্ডে আরবি ভাষায় 'মু'জামুল মুসান্নিফীন' শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিশ হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে চল্লিশ হাজার মুসান্নিফ তথা গ্রন্থরচয়িতার জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এর চারটি অংশ ১৩৫৪ হিজরী সালে হায়দারাবাদস্থ আসিফী সরকারের খরচে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম অংশে সাধারণ উপকারী কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: ইলমের মূল্যায়ন এবং যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রথম প্রথম আবিস্কৃত হয়েছে, তার উপর কতিপয় অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ হিসেবে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের উপর কিছু পরিচ্ছেদ, একটি বিশেষ অধ্যায় ইসলামে সংকলন বিষয়ে রয়েছে, প্রকার ও শ্রেণী বিভেদে নারী-পুরুষ রচয়িতাদের উপর কিছু অধ্যায়, বিভিন্ন কলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর কয়েকটি পরিচ্ছেদ ইত্যাদি। এই গ্রন্থের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিশালতা ও ব্যাপকতা। গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা জালাবি

রচিত 'কাশফুন জুনূন' এবং এর মধ্যে যা বাদ পড়েছে তার উল্লেখ করার পর গ্রন্থকার বলেন :

'অতএব, 'কাশফ'-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং বই-পুস্তক ও রচনার অধ্যায়ে ওই গ্রন্থে যা যা আসেনি তার পরিপূরক হিসেবে আমাদের এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এতে ব্যাপকতা আনার প্রচেষ্টায় আমি কোন ত্রুটি করি নি। ইসলামী যুগে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান; তা ইসলামী হোক বা অন্য কোনো দার্শনিক ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে হোক, এ ক্ষেত্রে যেসব আলেম-উলামা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের জীবন-চরিত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। এর মধ্যে ঐসব আলেম ও গ্রন্থকারও রয়েছেন– যারা আরব ও অনারব বিভিন্ন দেশে যেমন ইরাক, মিশর, আন্দোলুস, রোম, খোরাসান, মা ওয়ারাউন নাহার এলাকাসমূহ, সিন্ধু, ভারত ইত্যাদি দেশে লালিত-পালিত হয়েছেন। আমি এটা বলছি না যে, এ গ্রন্থে আমি সমস্ত আলেম-উলামার কথা আলোচনা করেছি। এতে ছোট-বড় সকল লেখক ও গ্রন্থরচয়িতার নাম চলে এসেছে। কারণ, তা তো মানুষের সাধ্যের বাইরে।'[১]

তারপরেও এ গ্রন্থটি কত ব্যাপকতার সাথে লেখা হয়েছে, তার একটা প্রমাণ হচ্ছে, এর মধ্যে ইবরাহীম নামের যেসব লেখক ও আলেমের আলোচনা এসেছে, শুধু তাদের সংখ্যাই হচ্ছে ৩৪৮টি। দুঃখের বিষয়, এই মুল্যাবান সম্পদটি হায়দারাবাদের একটি হস্তে লেখা বইয়ের পাঠাগারে সমাহিত অবস্থায় রয়ে গেছে। কারণ, দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিম প্রাচ্যে রচনা ও গবেষণাকর্মসমূহ তার জ্ঞানগত মান, তাতে লেখকের মেহনত এবং তার প্রতি জ্ঞানপিপাসুদের প্রয়োজন কতটুকু.. এসব দিয়ে বিবেচিত হয় না; বরং তা নির্ভর করে প্রচারণা ও মিডিয়ার উপর এবং তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকার কিভাবে গ্রহণ করেছে তার উপর।

এই তালিকায় আরো আছেন 'নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামে' ওয়ান নাওয়াযির'[২] শীর্ষক গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানি (মৃত্যুঃ ১৩৪১ হিঃ)। আট খন্ডের এই গ্রন্থটিতে ইসলামের প্রথম শতাব্দি থেকে চৌদ্দ শতাব্দি অবধি ভারতের স্বনামধন্য চার হাজার পাঁচ শত (৪৫০০) বড় বড়

১. প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৯

২. ভারতের হায়দারাবাদস্থ দায়েরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়্যা থেকে এই গ্রন্থের দু'টি সংস্করণ বের হয়।

ব্যক্তিত্বদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। ভারতের মহাপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনচরিত সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে জানার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়াদির কালের ব্যাপ্তি হচ্ছে ইসলামের প্রথম শতাব্দি থেকে হিজরী চৌদ্দ শতাব্দি পর্যন্ত এবং স্থানের ব্যাপ্তি সুদূর খায়বর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এটা আলোচ্য গ্রন্থের এমন এক বৈশিষ্ট্য– যাতে আরব ও মুসলিম দেশসমূহে রচিত জীবনীগ্রন্থ বিষয়ক আর কোনো গ্রন্থই এর সমকক্ষ নয়।[১]

এছাড়া, লেখক তার এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম অন্বেষণ, ইলমি আমানত, চয়ন ও সংক্ষেপনের সৌন্দর্য রক্ষা, যার জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা হবে, তার বিশেষত্ব ও শ্রেণী তথা স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তো আছেই। আলোচ্য লেখকের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে 'আস সাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দ' (ভারতের ইসলামী সংস্কৃতি)।[২] এ গ্রন্থটি বিভিন্ন ইসলামী কলা, সাহিত্য ও যুক্তিবিদ্যায় ভারতীয় আলেম-উলামার লিখিত গ্রন্থসমূহ, ভারতে ইলমি আন্দোলন ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, বিভিন্ন সিলেবাস ও পাঠপদ্ধতি এবং তাতে যুগে যুগে যে পরিবর্তন এসেছে, তার হেতু ও নেপথ্য কারণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিপূর্ণ একটি গাইড বইয়ের মতোই। অন্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে সিলেবাস ও পাঠ্যভুক্ত বই-পুস্তকের ইতিহাস কারণসমূহসহ কোনো গ্রন্থ এভাবে রচিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। এছাড়া, তার রচিত আরো একটি গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে 'আল হিন্দ ফিল আহদিল ইসলামী' (ইসলামী যুগে ভারত)[৩]। শেষোক্ত এ গ্রন্থটি বিভিন্ন দেশ ও শহরের নিদর্শন ও লিপিবিষয়ক গ্রন্থমালার এক স্বর্ণ কড়ি। এর একেকটি অধ্যায়ে যা আছে, তা একটি পাঠাগারের সমান এবং একটি পৃষ্ঠায় যা আছে, তা একটি বৃহদাকারের বইয়ের সমপরিমাণ।

---

১. ভারতের বাইরে মহান ব্যক্তিদের জীবনী ও তাদের স্তরবিষয়ক গ্রন্থসমূহের সবই রচিত হয়েছে বিশেষ কোনো যুগ ও শতাব্দী বা বিশেষ কোনো প্রদেশ, অথবা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর উপর, যেমন– মুহাদ্দিস, ফিকাহশাস্ত্রবিদ বা নাহববিদ অথবা চিকিৎসাবিদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। পক্ষান্তরে, এই গ্রন্থটির মধ্যে প্রতিভাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন সব শ্রেণী ও স্তরের লোকদের আলোচনা চলে এসেছে।

২. দামেশকের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৩৭৭ হিজরি (১৯৫৮ ইং) সালে প্রকাশিত। এ সংস্করণটি শেষ হয়ে গেছে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী ও উপসংহারসহ দামেশকের আরবি ভাষা একাডেমি (প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান) হতে অচিরেই প্রকাশিত হবে, ইনশা আল্লাহ।

৩. হায়দ্রাবাদের দায়েরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়্যাহ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে।

এধরণের বিজ্ঞ আলেম ও লেখক তথা যারা একেকজন একেকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করে গেছেন- তাদের মধ্যে আল্লামা হামিদুদ্দিন ফারাহি (মৃত: ১৩৪৯ হি:) অন্যতম। যিনি মুআল্লিম আবদুল হামিদ ফারাহি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ এক পদ্ধতি রয়েছে– যাতে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সম্পর্কযুক্ত করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে 'আল ইমআন ফী আক্বসামিল কুরআন' এবং 'আর রা'যুস সাহীহ ফী মান হুয়া আয যবীহ' অন্যতম। শেষোক্ত গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সেরা গ্রন্থ।

এধরণের আরো যেসব লেখক রয়েছেন– তাদের মধ্যে 'আবুল আলা ওয়া মা ইলাইহি'[১] গ্রন্থের লেখক আল্লামা আবদুল আজিজ মায়মানি রাজকোটি (মৃত: ১৩৯৮ হি:)ও রয়েছেন। উল্লেখিত গ্রন্থটি গভীরতা ও সূক্ষ্ম সম্পাদনার দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। তাঁর লেখা আরেকটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'সামতুল লাআলি'।[২] আল্লামা আবদুল আজিজ মায়মানি দামেশকস্থ আরবি ভাষা একাডেমি এবং আল্লামা ইবনে মানযূর বিরচিত 'লিসানুল আরব' অভিধানের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

ভারতের প্রথিতযশা আলেম ও গবেষক যারা ইলমে হাদীস তথা হাদীস শাস্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বকোষ ও একাডেমির মত ভূমিকা রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বৃহদাকারের তিন খন্ডে বিভক্ত 'তুহফাতুল আহওযী ফী শরহে জামে আল তিরমিযী' শীর্ষক গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহিম মুবারকপূরী আজমগড়ী (মৃত: ১৩৫৩হি:)। এ গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ তিনি আলাদা একটি খন্ড রচনা করেন– যাতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম-পরিচয়, তাদের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান, মুহাদ্দিসদের শ্রেণী এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে হাদীস বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১. গ্রন্থটি আজমগড়স্থ দারুল মুসান্নিফীন থেকে তাদের প্রকাশনা সিরিজের আওতায় প্রকাশিত হয়। একইভাবে তা ১৩৪৪ হি: সনে কায়রোর 'মাতবা সালাফিয়া' থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা আহমদ তৈমূর, শাইখ আহমদ আল আসকন্দরি, শাইখ আবদুল ওহহাব নাজ্জার এবং আল্লামা আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের প্রশংসা ও মতামত রয়েছে।

২. ১৯৩৬ ইং সালে মিশরের রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক গ্রন্থটি বৃহদাকারের তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে আরো আছেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইয়াহয়া কান্দালভি সাহারানপূরী (মুহাজেরে মদিনা)। গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু গুরুত্ব দিতেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর সযত্ন দৃষ্টি কত প্রশস্ত ছিল- এর প্রমাণস্বরূপ বড় আকারের ছয় খন্ডে লিখিত তাঁর 'আউজাযুল মাসালিক ইলা মুআত্তা মালেক' শীর্ষক গ্রন্থটিই যথেষ্ট। উল্লেখিত এ গ্রন্থের উপর তিনি যে ভূমিকা রচনা করেছেন এবং একইভাবে 'লামেউদ দারারি আলা জামে আল বুখারি' শীর্ষক গ্রন্থের উপর তিনি যে ভূমিকা রচনা করেছেন- এই দু'টি ভূমিকাকে মূল্যবান মৌলিক গ্রন্থদ্বয় তথা 'মুআত্তা মালেক' ও 'জামে আল বুখারী' এবং এর রচয়িতাদ্বয় সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টি ছোট সাইজের বিশ্বকোষ বলা চলে। এছাড়া, তাতে রয়েছে উসূলে হাদীস ও আসমাউর রিযাল তথা হাদীস শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি ও হাদীস বর্ণনাকারীদের বিষয়ে উপযোগী বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ। পাশাপাশি, প্রসিদ্ধ চার ইমাম ও তাঁদের মাযহাব এবং এ বিষয়ে ভারতে যেসব বড় মাপের আলেম ও মুহাদ্দিস কাজ করেছেন, তাদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে ওই ভূমিকাদ্বয়ে। অনুরূপ তাঁর রচিত 'হজ্জাতুল ওদা' (বিদায়ী হজ) ও 'ওমারাতুন নবী (সা.)' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত।

তাদের মধ্যে আরো আছেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা হাবিবুর রহমান আজমি। তাঁর বিশেষত্ব ছিল ইলমে হাদীস ও আসমাউর রিযাল তথা ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনাকারী, হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্র এবং বিশেষ করে হাফিজ আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম আল সানআনি (মৃত: ২১১ হি:) সংকলিত হাদীসের গ্রন্থ 'মুসান্নাফ'[১] সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে। তিনি স্বতন্ত্র একটি খন্ড রচনা করেন শুধু এই গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ। এর পূর্বে তিনি 'মুসনাদে হামিদি' ও 'সুনানে সায়ীদ ইবনে মানসূর'[২] গ্রন্থদ্বয়েরও সম্পাদনা করেন।

---

১. বৈরুতের 'আল মজলিসুল ইলমি' গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ভারতের সামলাকে দাভেল, করাচি ও জোহাসবার্গে এ প্রতিষ্ঠানটির অনেক শাখা অফিস রয়েছে। জোহাসবার্গে বসবাসরত শাইখ মুহাম্মদ মিঞা আল সামলাকি আল হিন্দি (মৃত: ১৩৮২ হি:) এই মজলিসে ইলমিটি প্রতিষ্ঠা করেন।

২. এছাড়া তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল মারওযি রচিত 'কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব' এবং হাফেজ নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর হায়ছামি কর্তৃক 'কুতুবে সিত্তা'র ওপর প্রণীত 'কাশফুল আসতার আন যাওয়ায়েদুল বাজ্জার' গ্রন্থদ্বয়েরও সম্পাদনা করেন। তাঁর কাছ থেকেই মুআসসাতুর রিসালাহ (প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড এবং হাফেজ ইবনে হাজর আসক্বালানির 'আল মাতালিবুল আলিয়া বিযাওয়ায়েদিল মাসানীদ আছ ছামানিয়া' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দালভি (তাবলিগ জামাতের সাবেক আমির) (মৃত: ১৩৮৪ হি:) রচিত বৃহদাকারের তিন খন্ডের 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থটি সাহাবীদের জীবনকথা ও তাঁদের ঈমানদীপ্ত সীরাত এবং তাঁদের নৈতিক ও আধ্যাত্ম জীবনাচারের ক্ষেত্রে প্রায় একটি বিশ্বকোষের মতোই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এ যাবত যত বই-পুস্তক রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ গ্রন্থটি অন্যতম।[১]

গবেষক ও বিশ্লেষকদের এ মহান তালিকায় আরো যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত গবেষক ইমতিয়ায আলী কুরাশি রামপুরী (মৃত: ১৯৮১ ইং) যিনি ইমাম সুফিয়ান সউরির 'তাফসীরুল কুরআন কারীম' শীর্ষক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটির উপর প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী লিখেছেন এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি তাফসির সংকলনের ইতিহাস ও ইমাম সউরির জীবন-চরিত বিষয়ে সুবিস্তর একটি ভূমিকাও রচনা করেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৪। গ্রন্থের শেষে ইমাম সউরির কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন– তাদের জীবনী, যেসব বিষয় বাদ পড়েছে সে বিষয়ের উপর একটি উপসংহার রয়েছে। সব শেষে রয়েছে তথ্যসূত্র। গ্রন্থটি রামপুর (ভারত) থেকে ১৩৮৫ হি: (১৯৬৫ ইং) সনে মুদ্রিত হয়।

তিনি আরো যেসব গ্রন্থ সম্পাদনা করেন এবং টীকা-টিপ্পনী লিখেছেন, তার মধ্যে আবু উবাইদ আল কাসিম ইবনে সাল্লাম বিরচিত 'কিতাবুল আযনাস মিন কালামিল আরব ওয়া মা ইশতাবাহা ফিল লাফযি ওয়াখ তালাফা ফিল মাঅনা' শীর্ষক গ্রন্থ অন্যতম। গ্রন্থটি 'আল মাতবাআ আল ক্বায়্যিমা লিমাবানিল হিন্দ' থেকে ১৩৫৬ হি: (১৯৩৮ ইং) সনে মুদ্রিত হয়।

হায়দ্রাবাদস্থ দায়েরাতুল মা'আরেফ আল উসমানিয়াহ্ :

দ্বীনি ও ইলমী বই-পুস্তকগুলোকে প্রাচীন পাঠাগারে পরিত্যক্ত ও সমাহিত অবস্থা থেকে বের করে নতুন জীবন প্রদান এবং সেগুলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সম্পাদনা করে ছাপিয়ে মুসলিম বিশ্বে ছড়ানোর ক্ষেত্রে যেসব বড় বড় প্রকাশনা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হায়দ্রাবাদস্থ দায়েরাতুল মা'আরেফ আল উসমানিয়াহ্। প্রতিষ্ঠানটি ১৩০৬

---

১. গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ হায়দ্রাবাদস্থ দায়েরাতুল মা'আরেফ আল উসমানিয়া থেকে বের হয়। পরবর্তী সংস্করণগুলো দামেশকে ও অন্যান্য জায়গা থেকে প্রকাশিত।

হি: (১৮৮৮ ইং) সালে আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন বালগারামি, মাওলানা আবদুল ক্বাইয়ূম ও মাওলানা আনোয়ার উল্লাহ খানের দিক নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকে হাদীস, আসমাউল রিযাল, ইতিহাস, গণিতশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ১৫০ এর অধিক এমন সব মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যা থেকে মুসলিম বিশ্ব ও জ্ঞানীমহল দীর্ঘ দিন থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং যেসব গ্রন্থ সম্পর্কে আলেম-উলামা ও শিক্ষক সমাজ একে অপরের কাছ থেকে শুধু শুনেই আসছিলেন। দায়েরাতুল মা'আরেফ আল উসমানিয়্যার এই উদ্যোগ মূলত: ইলম ও দ্বীনের প্রতি এক মহান খিদমত।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় মুসলমানদের যে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক, গভীর ভালোবাসা রয়েছে- যা এখনো অব্যাহত আছে- এই খেদমত তার একটি বিরাট প্রমাণ। মহান এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টা, এর কাজের মাহাত্ম্য এবং ঐতিহ্যগত যেসব জ্ঞান ও ইলম এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তার মূল্যয়নের কথা অকপটে স্বীকার করেন ইউরোপ ও প্রাচ্যের বড় বড় আলেম ও সংস্কৃতিমনা বোদ্ধা মহল।[১]

আরব বিশ্বে আরবি ভাষায় রচনা ও সম্পাদনাকর্ম :

আরবি হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ইলমি ভাষা। অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যে বিস্তর পরিসরে এবং উন্নত পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হবার ক্ষেত্রে আরবি ভাষাই বেশি হকদার। ফলে, আরব বিশ্বে এ ভাষায় এমন কিছু রচনা ও গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়- সংখ্যা ও আকারের দিক দিয়ে তা যদিও এই আরবি ভাষা এবং আরব বিশ্বের বিশালতা ও গুরুত্বের তুলনায় যথাযোগ্য নয়, তারপরও সেসব রচনামালা নিঃসন্দেহে ইলমি গবেষণা, বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য এবং সুন্দর বিশ্লেষনের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু ক্রুটি ও প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় থাকা সত্ত্বেও এসব রচনার তালিকার শীর্ষে রয়েছে ডঃ আহমদ আমিন বেগ কর্তৃক লিখিত 'ফাজরুল ইসলাম' ও 'দুহাল

---

১. এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের তালিকায় রয়েছে: 'মুসনাদে আবি দাউদ আত তায়ালসি', আল্লামা বায়হাকির 'আস সুনান আল কুবরা', ইমাম হাকেম রচিত 'আল মুসতাদরাক' ও 'মাঅরিফাতু ইলমিল হাদীস', আল্লামা ইবনে আবদিল বার রচিত 'আল ইসতিআব ফী মাআরিফাতিল আসহাব', আল্লামা যাহাবির 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ', ইবনে হাজরের 'তাহযিব আত তাহযিব', ইমাম বুখারির 'আত তারিখুল কাবির', ইবনে জওযি রচিত 'আল মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম', ভারত সম্পর্কে লেখা আল বিরুনির গ্রন্থ, ইবনে মাকূলা রচিত 'আল ইকমাল' এবং আবি আলী আল মারযূক্বি রচিত 'আল আযমিনা ওয়াল আমকিনা' ইত্যাদি।

ইসলাম' সিরিজ। কারণ, এর লেখকের কোনো কোনো মতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, রয়েছে বিতর্কের সুযোগ।[১] আমি যখন এ সিরিজের বইগুলো পড়ি তখন এর ওপর কিছু টীকা লিখেছিলাম। এ সম্পর্কে আমি সম্মানিত লেখককে অবহিতও করেছিলাম যখন তার সাথে কায়রোতে আমার প্রথমবার সাক্ষাত হয় ১৯৮১ ইং সনের জানুয়ারি মাসে।

তিনিও আমার টীকা-টিপ্পনী সম্পর্কে জানতে এবং সেই টীকা সম্বলিত আমার কপিটিকে সংরক্ষিত করে রাখতে পছন্দ করেন। তবে প্রাচীন বই-পুস্তকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিষয়গুলোর সংকলন, সেগুলোর গবেষণামূলক বিশ্লেষন, তা থেকে ফলাফল বের করে আনা এবং বাঘা বাঘা প্রাচ্যবিদদের লেখার চাইতেও উন্নতমানে সমসাময়িক রচনাশৈলীতে ইসলামী ইতিহাসকে পেশ করার ক্ষেত্রে এই সিরিজের গ্রন্থসমূহ যে একটি আদর্শ ও নমুনা- তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি, এতে সময়োপযোগী মনোরম মুদ্রণ ব্যবস্থা, অকৃত্রিমতা, সুন্দর রচনাশৈলী ও চমৎকার উপস্থাপনা ভঙ্গিতো আছেই।

এক্ষেত্রে, বাক ও রচনাশৈলীর রাজপুত্র আমির শাকিব আরসালানের রচনাসমগ্র এবং বিভিন্ন গ্রন্থের উপর তার টীকা-টিপ্পনীকেও সংযুক্ত করা যায়। বিশেষ করে, তার লেখা 'আল হুলালুস সিন্দিয়্যা ফি আর রিহলাতিল আন্দোলিসিয়্যাহ'[২] শীর্ষক গ্রন্থ (১-১০ খন্ড) এবং চার খন্ডে বিভক্ত 'হাদেরুল আলম আল ইসলামী (মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা)' শীর্ষক গ্রন্থের উপর তার টীকাসমূহ এ ক্ষেত্রে অন্যতম। শেষোক্ত গ্রন্থটির মূল লেখক লথ্রপ স্টুডার্ড (Lothrop Stoddard)। অনুবাদ করেন প্রফেসর আজ্জাজ নুয়াইহিদ। প্রথম গ্রন্থটি ইসলামী আন্দোলুস বিষয়ে একটি ছোট-খাটো বিশ্বকোষ। আর দ্বিতীয়টি মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা, ব্যক্তিত্ব, আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষই বটে।

এ বিশ্বকোষে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ ও প্রাচ্যবিদদের উপর বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা, রয়েছে ইসলামী সভ্যতা এবং তা নিয়ে জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যবান কিছু গবেষণা, উসমানীয় রাষ্ট্র এবং এ রাষ্ট্রের ভিতর নানা ধরণের যেসব বিরোধিতা ও পরস্পর বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম ঢুকে

১. এ প্রসঙ্গে 'আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' আল ইসলামী' শীর্ষক গ্রন্থের ২৮১-৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. গ্রন্থটির তিনখন্ড মুদ্রিত হয়েছে।

পড়েছিল, সে সম্পর্কে বেশ কিছু ডুকোমেন্টারি তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে ঐ গ্রন্থে। ঐ বিশ্বকোষস্বরূপ গ্রন্থে আরো স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দেশে আরব ও ইসলামী বিজয়, বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিজাতীয় আগ্রাসন ও বিরোধী আন্দোলনসমূহের ইতিহাস, বিভিন্ন মহাদেশে ইসলামী জাগরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য। এছাড়া, তাতে ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং বাতিলের অপনোদন সম্পর্কেও অনেক জ্ঞানগর্ভ উপকারী গবেষণা ও প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়। তাঁর আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'গাযওয়াতুল আরব ফি ফ্রান্সা ওয়া শিমালাই ইতালিয়া ওয়া ফী সুইসারাহ' (ফ্রান্স, ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে আরবদের অভিযান)।

প্রখ্যাত লেখক খাইরুদ্দিন যরকলি বিরচিত 'আল আ'লাম' (সংযুক্তি, রেখা ও ছবিসহ মূল গ্রন্থটি বারো খন্ডে বিভক্ত) হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত, প্রাচ্যবিদ ও আরব অভিবাসী এবং মূল আরবের খ্যাতনামা সব নারী-পুরুষের জীবন-কাহিনী বিষয়ে একটি অভিধান। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি এমন এক একাডেমিক বিশ্বকোষ মানের কর্ম যার জন্য এর রচয়িতা বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এমন এক মহান কর্মে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করতেই হয়। বিস্তর জ্ঞান, বিশাল সংগ্রহ, সুন্দর উদ্ধৃতি ও সংক্ষিপ্তকরণ এবং অন্যান্য গবেষক ও গ্রন্থকারদের পরিশ্রম ও সময় সাশ্রয় করে দেবার ক্ষেত্রে লেখকের পান্ডিত্য ফুটে উঠেছে এতে।

একইভাবে জনাব আব্বাস মাহমূদ আক্কাদ এবং মুহাম্মদ কুর্দ আলীর লেখা রচনাসমূহও বিষয়ের গভীরতা, জ্ঞান ও শিক্ষার বিশালতা এবং বিদেশি উৎস সম্পর্কে সম্যক অবগতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। বিশেষ করে আব্বাস মাহমূদের লেখা 'আবক্বারিয়্যাত' সিরিজ এবং 'আল মারআ ফিল কুরআন' (কুরআন শরীফে নারী), 'আসরুল আরব ফিল হাদারাতিল আউরোব্বিয়্যা' (ইউরোপিয়ান সভ্যতার উপর আরবদের প্রভাব), 'হাক্বায়েকুল ইসলাম ওয়া আবা'তিলু খুসূমিহি' (ইসলামের বাস্তবতা ও ইসলাম বিরোধীদের ভ্রান্তিসমূহ) ইত্যাদি শীর্ষক গ্রন্থ ও গবেষণাসমূহ প্রণিধানযোগ্য। অন্যদিকে, জনাব মুহাম্মদ কুর্দ আলী বিরচিত 'আল ইসলাম ওয়াল হাদারাতুল আরবিয়্যা' (ইসলাম ও আরব সভ্যতা) এবং 'খুতাতুশ শাম' (সিরিয়ার পরিকল্পনাসমূহ) শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় জ্ঞানগর্ভ রচনা, বিশ্বকোষ ও একাডেমি মানের কর্ম।

অনুরূপ ডঃ জাওয়াদ আলী লিখিত 'তারিখুল আরব ক্বাবলাল ইসলাম' (ইসলাম পূর্ব আরবদের ইতিহাস) এবং ফুয়াদ সাজকীন লিখিত 'কিতাবু তারিখ

আত তুরাসিল ইসলামী' (ইসলামী ঐতিহ্যের ইতিহাস) শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ও একাডেমি মানের রচনা– যা যথাযথ মূল্যায়নের দাবি রাখে। যদিও গ্রন্থের কিছু কিছু বিষয় আলোচনা ও সমালোচনা সাপেক্ষ। এধরণের আলোচনা-সমালোচনা যে কোনো যুগে জ্ঞানপিপাসু ও গবেষকদের অধিকার। ইসলামী যুদ্ধ ও জয় সম্পর্কে মেজর জেনারেল মাহমূদ শেত খাত্তাব কর্তৃক 'ক্বাদাতুল ফাতহিল ইসলামী' (ইসলামী বিজয়ের কমান্ডার) ও 'আর রাসূলুল ক্বায়েদ' (কমান্ডার রাসূল) শিরোনামে রচিত গ্রন্থদ্বয় সামরিক, ঐতিহাসিক ও জ্ঞানের দিক দিয়ে একেকটি বই যেমন মূল্যবান, তেমনি বিস্তর তথ্য সম্বলিতও বটে।

এ প্রসঙ্গে বন্ধুবর জনাব আনোয়ার জুনদি কর্তৃক গৃহীত অত্যন্ত উপকারী, সুবিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত বিশাল ইলমি প্রকল্পটির কথা কখনোই ভোলবার মত নয়। প্রকল্পের নাম হচ্ছে 'মাওসূআতু মুক্বাদ্দিমাতিল উলূম ওয়াল মানাহিয' (ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পদ্ধতি বিশ্বকোষ)। এর প্রথম খন্ডটি ইসলামী চিন্তা সম্পর্কিত। দ্বিতীয় খন্ড ইসলামের ইতিহাসের উপর। তৃতীয় খন্ড সমকালীন মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে। আর চতুর্থ খন্ড ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। এই চারখন্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাকি খন্ডসমূহের মধ্যে, পঞ্চম খন্ড– খ্রিষ্টান মিশনারি, প্রাচ্যবাদ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক প্রচার সম্পর্কে, ষষ্ঠ খন্ড– ইসলামী সমাজ সম্পর্কে, সপ্তম খন্ড– সভ্যতা, সাইন্স ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ সম্পর্কে, অষ্টম খন্ড– ইসলাম এবং বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে, নবম খন্ড– প্রচলিত ভুল ও সংশয়সমূহ সম্পর্কে আর দশম খন্ড হচ্ছে ইসলামী চেতনা আন্দোলন সম্পর্কে। এ কাজটি যদি সম্পন্ন হয় এবং সকল খন্ড সমেত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তাহলে ইসলাম ও মুসলমান বিষয়ে তা এক বিশাল বিশ্বকোষে পরিণত হবে। ইসলামী বিজ্ঞান ও শিষ্টাচারের উপর এক সমৃদ্ধ পাঠাগার হিসেবে বিবেচিত হবে।

যরকলির 'আল আ'লাম' আর ফুয়াদ সাজকিনের 'তারিখ আত তুরাসিল ইসলামী' গ্রন্থদ্বয়ের পর ওমর রেজা কাহালাহ রচিত 'মু'জামুল মুআল্লিফীন' (আরবি গ্রন্থ রচয়িতাদের জীবন-চরিত) শীর্ষক গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পনের খন্ডে বিভক্ত এ বিশাল গ্রন্থটির মধ্যে যদিও সমকালীন অনেক লেখকের নাম সন্নিবেশিত হয়নি, তারপরও রচনাকর্মটি সাধুবাদযোগ্য ও প্রশংসনীয় একটি প্রয়াস।[১]

---

১. তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন ১৩৭৬ হি. (১৯৫৭ ইং) সালে এবং তা 'মাকতাবাতুল মুসান্না' ও 'দারু ইহয়া ইত তুরাসিল আরবি' প্রকাশ করেছে।

আর শরয়ী ও ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামে আক্বীদা ও ফিকাহ ভিত্তিক শিক্ষাঙ্গন (স্কুল অব থট) প্রতিষ্ঠাতাদের উপর এবং বিভিন্ন ইসলামী সম্প্রদায় ও তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত আল্লামা মুহাম্মদ আবূ যাহরার গ্রন্থসমূহ, প্রখ্যাত দাঈ ও মুজাহিদ বন্ধুবর ডঃ মুস্তাফা আস সিবায়ী রচিত 'আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' আল ইসলামী' (সুন্নাত ও ইসলামী আইন প্রণয়নে তার অবস্থান) গ্রন্থটি অন্যতম। শেষোক্ত গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সেরা ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর আরো একটি গ্রন্থ আছে 'আল মারআ বাইনাল ফিক্‌হি ওয়াল ক্বানূন' (ফিকাহ ও আইনের মাঝে নারী) শিরোনামে।

একইভাবে তাঁর সহপাঠী ও আমাদের বন্ধু উস্তাদ মুস্তাফা আহমদ আয যারক্বা কর্তৃক রচিত 'আল মাদখালুল ফিক্বহি আল আম' (সাধারণ ফিকাহ'র প্রাথমিক বই) শীর্ষক গ্রন্থটি যেসব মুসলিম দেশ ইসলামী শরিয়ত ও সিভিল ইসলামী কানূন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছে, সেসব দেশ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা মিটানোর মত একটি বিরাট ইলমি প্রয়াস। অনুরূপ, শহীদ আবদুল ক্বাদের আওদাহ কর্তৃক প্রণীত 'আত তাশরীউল জিনায়ী আল ইসলামী মুক্বারিনান বিল ক্বানূনিল ওয়াদায়ী' (মানবরচিত আইনের তুলনায় ইসলামী অপরাধদমন আইন) শীর্ষক গ্রন্থটিও আইন-কানূনের উপর গবেষণামূলক এক বিরাট ইলমি কাজ ও ফসল।

ইমাম শহীদ হাসানুল বান্নার পিতা শাইখ আহমদ ইবনু আবদুর রহমান আল বান্না আস সাআতি 'মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল'কে বিভিন্ন ফিক্বহী অধ্যায়ে বিন্যস্ত ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে কাজ করেন, তাও এক মহান ঐতিহাসিক কর্ম। গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় 'আল ফাতহুর রব্বানি লি তারতিবে মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল শায়বানি' শিরোনামে।[১] একই বিষয়ে আল্লামা আহমদ মুহাম্মদ শাকের ব্যক্তিগতভাবে যে কাজ করে গেছেন, তা অনেক সময় শক্তিশালী একটি দলের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।[২]

---

১. দুঃখের বিষয়, এ ইলমি কর্মটি সম্পূর্ণ হয়নি। বিশাল এই গ্রন্থের ২২ খন্ড পর্যন্ত বের হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ইখওয়ানুল মুসলিমীন প্রিন্টিং প্রেস থেকে।

২. আল্লামা আহমদ মুহাম্মদ শাকের আলোচ্য গ্রন্থ থেকে হাদিসগুলোকে তাখরিজ করে ধারাবাহিক করেন, বিষয়ভিত্তিক নির্ঘন্ট তৈরি করেন এবং মূল্যবান টীকা লেখেন। তার সম্পাদনায় গ্রন্থটির পনের খন্ড প্রকাশিত হয়। পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষন করুক।

গভীর ও তুলনামূলক ইসলামিক স্টাডিজ :

সম্প্রতি এমন একটি বই বের হয়েছে– যা আধুনিক ও প্রাচীন দর্শন বিষয়ে একজন ফিকাহবিদ ধার্মিক আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তির বিস্তর পড়াশুনা ও গভীর দৃষ্টি এবং আধুনিক বিজ্ঞান– বিশেষত: পদার্থ ও জোতির্বিদ্যা-এর সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে তার সুতীক্ষ্ণ ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসকে আকর্ষণীয় কাহিনীর মাধ্যমে কত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং বৈজ্ঞানিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করা যায়, তা ঐ বইটি থেকে সহজেই অনুমেয়। সেই বই বা গ্রন্থটি হচ্ছে ত্রিপলী ও উত্তর লেবাননের মুফতি শাইখ নদিম আল জাসার প্রণীত 'কিচ্ছাতুল ঈমান বাইনাল ফাল্‌সাফাতি ওয়াল ইলমি ওয়াল কুরআন' (কুরআন, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোয় ঈমানের কাহিনী)।[১]

ইরাকি আলেম উস্তাদ মুহাম্মদ বাক্বের আল সদর লিখিত গ্রন্থদ্বয়ও গভীর তুলনামূলক গবেষণা, বিস্তর জ্ঞান, সমকালীন বিভিন্ন ব্যবস্থা ও দর্শন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির গুণে গুণান্বিত। গ্রন্থদ্বয়ের একটি হচ্ছে দু'খন্ডের 'ইক্বতিসাদুনা' (আমাদের অর্থনীতি)। প্রথম খন্ড বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক গবেষণার উপর। আর দ্বিতীয় খন্ডে ইসলামে অর্থনৈতিক মতবাদ কী, তা বের করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটির শিরোনাম হচ্ছে 'ফালসাফাতুনা' (আমাদের দর্শন) যা চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বের যুদ্ধে এক বিষয়ভিত্তিক গবেষণা। বলাই বাহুল্য, এই স্বীকারোক্তির মানে গ্রন্থদ্বয়ে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সবকিছুকে একবাক্যে মেনে নেয়া নয়।

এরপর আসে শহীদ সায়্যিদ কুতুব লিখিত গ্রন্থসমূহের পালা। এরমধ্যে বিশেষ করে 'আল আদালাতুল ইজতেমাইয়্যাহ ফিল ইসলাম' (ইসলামের সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা) শীর্ষক গ্রন্থটি।[২] তাঁর সহোদর মুহাম্মদ কুতুব কর্তৃক রচিত 'শুবহাত হাউলাল ইসলাম' (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম) এর মত বইসমূহ

---

১. তিনি হচ্ছেন 'আল হুসুনিল হামিদিয়্যা' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক শায়খ হুসাইন আল জাসার এর ছেলে। এ গ্রন্থটি প্রাচীন মাদ্রাসা ও হালকাসমূহের একটি শূন্যতা পূরণ করে এবং শিক্ষা ও শিক্ষকতার এক বিরাট প্রয়োজনীয়তা মিটায়। একইভাবে 'আল রিসালাতুল হামিদিয়্যা)ও সেই মানের একটি গ্রন্থ।

২. গ্রন্থের মূল্যায়ন ও গ্রন্থকারের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ওই গ্রন্থে তৃতীয় খলীফাতুল রাশিদ আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান রা. সম্পর্কে যা উল্লেখিত হয়েছে এবং খলীফা মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) এর সমালোচনায় যেসব বক্তব্য এসেছে, তার সবকিছুর সাথে এই লেখক একমত নয়। ইসমত শুধু আল্লাহর জন্যে।

এবং মনোবিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার উপর লিখিত তার অন্যান্য বইগুলোও পরবর্তীতে আসে। এছাড়া ডঃ মুহাম্মদ আল-বাহী'র বই 'আল ফিকরুল ইসলামী আল হাদীস' (আধুনিক ইসলামী চিন্তাধারা), উস্তাদ মুহাম্মদ আল মুবারক– যাকে সম্প্রতি (তখনকার সময় অনুপাতে) আরব বিশ্ব ও ইসলামী দাওয়াতি জগত হারিয়েছে-এর বই 'ফিল ফিকরিল ইসলামী আল হাদীস' (আধুনিক ইসলামী চিন্তা সম্পর্কে), ডঃ মুহাম্মদ মুহাম্মদ হুসাইন রচিত 'আল ইত্তিজাহাতুল ওয়াতানিয়্যা ফিল আদাবিল মুআসির' (সমকালীন সাহিত্যে জাতীয় ভাবধারা) ও 'হুসুনুনা মুহাদ্দাদা' (আমাদের দুর্গসমূহ হুমকির সম্মুখীন) শীর্ষক বইসমূহও এ তালিকায় পাওয়া যায়। বন্ধুবর ডঃ শায়খ ইউসুফ আল ক্বারদাভির গ্রন্থ 'ফিক্বহুয যাকাত' (ইসলামের যাকাত বিধান) হচ্ছে এক বিরাট বিশ্বকোষ মানের গবেষণাকর্ম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি উর্দু (বাংলা) ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দাওয়াতের লেখক ও ইসলামী চিন্তার আহ্বায়ক :

আমার এ প্রবন্ধ ছিল বিশেষভাবে এমনসব বিষয়নির্ভর গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম নিয়ে– যা একান্তই প্রাচ্যবিদদের বৈশিষ্ট্য ও রচনাক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যেসব গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম একাডেমিক বিশ্বকোষ মানের ধারা, তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিদেশি উৎসসমূহের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত তা নিয়ে। তবে মিশরে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' (মুসলিম ব্রাদারহুড)-এর বিশাল আন্দোলনের প্রভাবে সৃষ্টি হয় এক শক্তিশালী রচনা ও সাহিত্য জাগরণ।

সাহিত্য, লেখালেখি, গ্রন্থরচনা– যা একদা আলেমা-উলামা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল- তা গবেষণা ও সম্পাদনার গন্ডি থেকে বেরিয়ে এক বিশাল বিস্তৃত জাতীয় গন্ডির রূপ নেয়। সেখানে এমন কিছু বিজ্ঞ লেখক ও গ্রন্থকার তৈরি হয়– যারা সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করে এবং তাদের মনের ভেতরকার কর্মস্পৃহাকে, ঈমান ও আবেগকে নাড়া দেয়। যাদের বই-পুস্তক পাঠকের অন্তর যেমন ছুঁয়ে যায়, তাদের বিবেককেও পরিপুষ্ট করে। এসব দক্ষ ও পারদর্শী লেখকদের শীর্ষে রয়েছেন সায়্যিদ কুতুব, শায়খ মুহাম্মদ গাজালি, সায়্যিদ সাবেক ('ফিক্বহুস সুন্নাহ' শীর্ষক বিশাল গ্রন্থের লেখক), সুসাহিত্যিক আলী তানতাভি প্রমুখ। এসব লেখক এবং তাদের লিখিত ইসলামী দাওয়াতের বইসমূহের পর্যালোচনা করা ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী দাওয়াতের যারা

ইতিহাসবিদ তাদের বিষয়। গবেষণার ক্ষেত্রও এতই প্রশস্ত যে, তার জন্য স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে।[১]

আরব উপদ্বীপে সম্পাদনা ও গবেষণাকর্ম :

প্রচুর পরিমাণে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা একাডেমি ও উন্নতমানের আরবি পত্র-পত্রিকা থাকার কারণে সম্পাদনা ও গবেষণার যে আন্দোলন বিশেষভাবে মিশর ও সিরিয়ায় সৃষ্টি হয় এবং যা দিনদিন বিস্তৃতি লাভ করে, তা থেকে বেশ কিছু সময় আরব উপদ্বীপ বিচ্ছিন্ন ছিল। তবে শেষ দিকে এসে সৌদি সরকারের আমলে সেই আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এমন সব লেখা, প্রবন্ধ ও রচনা বের হয় যার মধ্যে গবেষণা ও সম্পাদনাধর্মী প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু কিছু একাডেমিক বিশ্বকোষের গুণে গুণান্বিত। এর নমুনা দেখা যায় উস্তাদ হামাদ জাসেরের[২] গবেষণাধর্মী ভৌগোলিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে, ভাষা ও অভিধানের উপর রচিত উস্তাদ আবদুল গফুর আত্তারের[৩] লেখা প্রবন্ধসমূহে, পরিকল্পনা ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে লিখিত শায়খ আবদুল কুদ্দুস আনসারির[৪] প্রবন্ধমালায় এবং ইসলামের চূড়ান্তকারী যুদ্ধ ও নববী যুগের প্রসিদ্ধ গাযওয়ার উপর ধারাবাহিক লেখা উস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ বাশমিলের গবেষণাধর্মী রচনার মধ্যে।[৫]

---

১. ভারতের লাখনৌস্থ নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত 'আল বাআস আল ইসলামী' ম্যাগাজিনে উস্তাদ ওয়াদেহ রশিদ নদভীর ধারাবাহিক কিছু প্রবন্ধ ছেপেছে– যার শিরোনাম ছিল 'আদাবুস সাহওয়াহ আল ইসলামিয়্যা'। উল্লেখিত প্রবন্ধ সিরিজটি এ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। ('আল বাআস আল ইসলামী', অষ্টম, নবম ও দশম সংখ্যা, ছাব্বিশতম খন্ড, ১৪০২ হি.-১৯৮২ ইং দ্রষ্টব্য)।

২. তিনি 'ফী সারাতি গামিদ ও যাহরান' ও 'ফী শিমালি গারবিল জাযিরা' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ের লেখক। একইভাবে তিনি 'আল মাউসূ আতুল জুগরাফিয়্যা লি জাযিরাতিল আরব' (আরব উপদ্বীপের ভৌগলিক বিশ্বকোষ) রচনায়ও অংশ নেন। শেষোক্ত বিশ্বকোষের পনেরটি খন্ড বের হয়েছে। আর এর সবই প্রকাশিত হয়েছে রিয়াদস্থ গবেষণা, অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুল ইয়ামামা' থেকে।

৩. যেমন– তার লেখা 'আস সিহাহ ওয়া মাদারিসুল মুজামাত আল আরবিয়্যা'। তিনি সম্পাদনা করেন যানজানির লেখা 'তাহযিব আস সিহাহ', জওহারির লেখা 'আস সিহাহ' এবং আযহারির লেখা 'মুক্বাদ্দামায়ে তাহযিব আল লুগাহ' শীর্ষক গ্রন্থসমূহ।

৪. যেমন– তার লেখা গ্রন্থ 'আ ছা রুল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ' (মদিনার প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নসমূহ) ও 'মাদিনাতু জিদ্দা' (জিদ্দা শহর)।

৫. এ সিরিজের দশ খন্ড বের হয়েছে যথা: 'গাযওয়াতু বদর আল কুবরা', 'গাযওয়াতু উহুদ', 'গাযওয়াতুল আহযাব', 'গাযওয়ায়ে বনী কুরায়যা', 'সুলহুল হুদায়বিয়্যা', 'গাযওয়াতু খায়বীর', 'গাযওয়াতু মাওতা', 'ফতহে মক্কা', 'গাযওয়াতু হুনায়ন' ও 'গাযওয়াতু তাবূক' প্রভৃতি।

এ ছাড়া আরো অনেক বই-পুস্তক ও গ্রন্থ রয়েছে– যা লেখা হয় ফিক্হ, ইসলামী আইন প্রণয়ন, হাদীস ও তাফসির এবং সমকালীন বিভিন্ন ইসলামী ইস্যু নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন, তাদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উল্লেখ করতে গেলে আমার আশংকা, 'তাতে এমন কিছু নাম ছুটে যাবে যারা সত্যি প্রশংসাযোগ্য।

আরব প্রাচ্যের আরবি ইসলামী সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্রগুলোতে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কঠিন পরিস্থিতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শক্তিশালী উপাদান এবং অনেক জ্ঞানপ্রবর, ভালো ভালো ইসলামী লেখক ও গবেষককে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও আরব আমিরাতে চলে আসতে অনুপ্রাণিত করে। কখনো কখনো এ প্রবণতা লেবানন ও জর্দানেও দেখা গেছে। এতে করে এসব দেশ যারা প্রায়শই বাইর থেকে ইলমি পণ্য আমদানি করত, কখনো যারা ইলম ও জ্ঞান রপ্তানি করেনি- তাদের জন্য এক বিরাট অর্জন সাধিত হয়।

তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওসব জ্ঞানী ও গবেষকদেরকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে, চাঙ্গা হয়ে উঠে রচনা ও গবেষণা আন্দোলন, তৎপর হয়ে উঠে সাইন্টিফিক সন্দর্ভ ও প্রবন্ধ তৈরির কাজ, বিশেষ করে, সৌদি রাজতন্ত্রের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে[১], কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে, দোহাস্থ কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে, আরব আমিরাতের আল আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বের হতে থাকে একের পর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও সন্দর্ভ যা বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে হয়ত কমবেশী হবে এবং মানদন্ডে হতে পারে বিভিন্নতর। কিন্তু এর সবটুকু উপকারিতা গ্রহণ করে আরব পাঠাগার, সম্মৃদ্ধ হয় আরবি গ্রন্থশালা। ওসব অভিবাসী বা শরণার্থী অথবা ভ্রমণকারী শিক্ষাবিদ জ্ঞানপ্রবরদের তালিকা দীর্ঘ বটে। কিন্তু সেই তালিকা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে– যারা ছিল প্রভূত কল্যাণের উৎস।

বিশ্ববিদ্যালয় মানের সন্দর্ভ ও পিএইচডি গবেষণাকর্মসমূহ :

পিএইচডি কোর্সের ছাত্র কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ডক্টরেট ডিগ্রির অভিসন্দর্ভ ও গবেষণা প্রবন্ধসমূহের যে নিয়ম ছিল, তার একটি ভূমিকা

---

১. তা হচ্ছে 'আল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়', 'রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়' (যা পরবর্তীতে কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রসিদ্ধ), জিদ্দাস্থ 'কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়', মক্কার 'উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়', মদিনার 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' ও বাহরানের 'পেট্রোল বিশ্ববিদ্যালয়'।

ছিল নতুন ও আধুনিক পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চর্চার ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে আগ্রহীদের সংখ্যাধিক্য, সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধানের অভাব এবং অনেক বিশ্ববিদ্যলয়ে সিরিয়াস দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নির্দেশনা না থাকার কারণে যদিও এসব প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভের অধিকাংশ বড় কোনো মূল্য বহন করতো না, তবে কিছু গবেষণা প্রবন্ধ সেসব সুকুমার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত যা ধারণ করে আজ প্রাচ্যবিদদের লেখাসমূহ প্রসিদ্ধ।

বিশেষ করে, এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন উৎসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তথ্যগুলোকে সংকলন করা, সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করা এবং সেখান থেকে ফলাফল বের করে নিয়ে আসা ইত্যাদি। পাশাপাশি, সেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যেগুলো সাধারণত: সংশ্লিষ্ট ভাষার সন্তান এবং ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের পক্ষে ধারণ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, এ ধরণের বিশিষ্ট লেখার মধ্যে ডঃ শুকরি ফয়সাল রচিত গ্রন্থ 'আল মুজতামাআতুল ইসলামিয়্যা ফিল ক্বারনিল আওয়্যাল' (প্রথম শতাব্দির ইসলামী সমাজ)[১], (মিশরের সাবেক ট্রাস্ট মিনিষ্টার) ডঃ শায়খ আবদুল মুনইম আন নামির[২] লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণামূলক গ্রন্থ 'আবুল কালাম আযাদ', আইনে শামস বিশ্ববিদ্যালয়স্থ কলা অনুষদের শিক্ষক আহমদ ইবরাহিম শরিফ রচিত গ্রন্থ 'মক্কা ওয়া মদিনা ফিল জাহিলিয়্যা ওয়া আহদির রসূল' (জাহিলি ও রসূলের যুগে মক্কা ও মদিনা)[৩], ডঃ নাদিয়া হাসানি সাক্বার রচিত গ্রন্থ 'আত তায়েফ ফিল আসরিল জাহিলি ওয়া ফী সাদরিল ইসলাম' (জাহিলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে তায়েফ)[৪], ডঃ মুহাম্মদ সায়্যিদ তানতাভি রচিত গ্রন্থ 'বানূ ইসরাঈল ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' (কুরআন ও সুন্নাহে বনি ইসরাইল) এবং ডঃ রামযি নাঅনাআহ বিরচিত 'আল ইসরাঈলিয়্যাত ওয়া আছারুহা ফী কুতুবিত তাফসির' শীর্ষক গ্রন্থ' (ইসরাইলি বর্ণনা ও তাফসির গ্রন্থসমূহে তার প্রভাব)।

১. গ্রন্থটি বের করেছে বাগদাদের আল মুছান্না লাইব্রেরী এবং মিশরের আল খানজি ১৩৭১ হিঃ (১৯৫২ ইং) সালে।
২. তাঁর লেখা 'তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ' ও 'কিফাহুল মুসলিমীন ফী তাহরীরিল হিন্দ' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কে রচিত অভারতীয় কোনো লেখকের লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।
৩. গ্রন্থটি মিশরস্থ দারুল ফিকরিল আরবি প্রকাশ করে।
৪. গ্রন্থটি ১৯৮১ ইং সালে মুদ্রিত হয়েছে জিদ্দাস্থ দারুল শুরূক্ব থেকে।

ইরান ও তুরস্কে :

ইরান ও তুরস্কে গড়ে ওঠা ইলমি ও গবেষণাকর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান স্বল্প। তবে তার মধ্যে ডঃ সায়্যিদ হুসাইন নসর কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ সবিশেষ উল্লেখ করা যায়। ভাষা ও গবেষণার দিক দিয়ে সেই গ্রন্থগুলো উচ্চ পর্যায়ের।

ইসলামী আরব মরক্কোতে :

উত্তর আরব মরক্কোতে বরাবরই সেই ইসলামী আরবি পাঠশালা বহাল রয়েছে যাতে সুবিস্তৃত অধ্যয়ন, পরিচ্ছন্ন ভাষা, হাদীসের মৌলিক গ্রন্থাবলি এবং সুন্নাহর উৎসসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে। আল্লামা শায়খ আবদুল হাই কাত্তানি আল হাসানি আল ইদরিসির গ্রন্থগুলো.. বিশেষ করে তাঁর লেখা 'আত তারতিবুল ইদারিয়্যা ফিল নিযামিল হুকূমাতিন নাববিয়্যাহ' (নববি সরকার পদ্ধতিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা) শীর্ষক গ্রন্থটি বিস্তর জ্ঞান ও প্রভূত কল্যাণ সম্মৃদ্ধ ইলমি বিশ্বকোষসমূহের মতোই।

আরব মরক্কোতে এমন অনেক লেখক ও গবেষক পান্ডিত্য অর্জন করেন যারা দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামী শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে গভীরভাবে মনযোগ দিতেন। যেমন– মরক্কোর নেতা আল্লামা আলাল ফারসি, শায়খ তাহের বিন আশূর ও তার সুযোগ্য ছেলে ফাদেল বিন আশূর, মালেক বিন নবী, মুহাম্মদ বশির আল ইবরাহিমি। দূর মরক্কোতে রয়েছেন উস্তাদ মুহাম্মদ আল ফারসি, আবদুল্লাহ কনূন, আবদুল কারিম আল খতিব, মাহদি বানআবূদ, আবদুস সালাম ইয়াসিন। আরো আছেন ডঃ আল হাবিব বাল খাজা, শাযলি নায়ফর, আহমদ আল হাম্মানি প্রমুখ। তারা সবাই লেখালেখি অব্যাহত রাখেন এবং পাঠকমহলকে উপকৃত করেন। সাথে সাথে তাদের সম্পাদনা ও গবেষণা দ্বারা ইসলামী ও আরবি গ্রন্থাগারকে সম্মৃদ্ধ করেন। সেখানে এমন কিছু লেখক ও গবেষকও আছেন– যারা মরক্কোর 'দাওয়াতুল হক্ব' (সত্যের দাওয়াত) এর মিম্বরে অধিষ্ঠিত এবং আরব বিশ্বের এই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত ইলমি পত্রিকাগুলো পরিচালনা করেন। চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যারা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ বহন করেন, সেসব লেখক ও গবেষকদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

আজকের জিহাদ ও অপরিহার্য দায়িত্ব :

আমার লেখা বই 'রিদ্দাতুন ওয়া লা আবা বাকরিন লাহা' থেকে নেয়া একটি উদ্ধৃতি দিয়েই আমি এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত করছি: "আজকের জিহাদ ও সংগ্রাম, নবুয়তের প্রতিনিধিত্ব, সবচাইতে মহান নৈকট্য এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে এই ধর্মহীনতার ঢেউয়ের মোকাবেলা করা যা গোটা মুসলিম বিশ্বকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে– যে ধর্মহীনতা আজ মুসলিম বিশ্বের বিবেক ও কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী ও যুবসমাজের অন্তরে ইসলামের আক্বীদা বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, ইসলামী বাস্তবতা ও পদ্ধতি এবং রেসালতে মুহাম্মদীর প্রতি হারানো আস্থা আবার ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে আজকের সবচাইতে বড় জিহাদ ও সংগ্রাম।

চিন্তাগত যে অস্থিরতা এবং মানসিক যে পেরেশানি আজকের আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজকে পেয়ে বসেছে, সেই অস্থিরতা ও পেরেশানিকে মুছে ফেলাই হচ্ছে সময়ের বড় ইবাদত। সাংস্কৃতিক ও মানসিকভাবে তাদেরকে ইসলামের প্রতি পরিতুষ্ট করাই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। পাশাপাশি, সেসব জাহিলি নীতি-নৈতিকতার মোকাবেলা করতে হবে– যা মানুষের মনের গহীনে বসে আছে এবং ইলমি ও মানসিকভাবে মানুষের বিবেকের উপর কর্তৃত্ব করছে। ঈমান, আত্মতুষ্টি ও সাহসের মাধ্যমে জাহিলি মূল্যবোধের স্থলে ইসলামী মূল্যবোধগুলোকে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।

আমাদের উপর দিয়ে পুরো একটি শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে এমনভাবে যার মধ্যে ইউরোপ আমাদের যুবসমাজ ও বিবেকগুলোকে লুট করেছে। আমাদের বিবেকে সন্দেহ, নাস্তিকতা ও শঠতার বীজ রোপণ করেছে, ঈমানী ও গায়েবী বাস্তব বিষয়াদির প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করেছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নতুন নতুন দর্শনের প্রতি বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। আর এ দীর্ঘ শতাব্দী জুড়ে আমরা ছিলাম এসব কিছুর মোকাবেলা করা থেকে অদৃশ্য বা বেখবর। নিজেদের কাছে যে ঐতিহ্য ছিল, তার উপর নির্ভর করে বসে রয়েছি। নতুন কিছু সৃষ্টি করিনি আমরা। ইউরোপের সেসব দর্শন, পদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে সময় কাটিয়েছি। বৈজ্ঞানিকভাবে সেগুলোর হিসাব-নিকাশ করিনি। অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকের ন্যায় সেসব দর্শন ও রীতি-নীতির সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থেকেছি। তাড়াহুড়োর মধ্যে করা হালকা মানের গবেষণা এবং পুরনো ইলমি সম্পদ বৃদ্ধির মধ্যে আমরা আমাদের মনের তৃপ্তি খুঁজেছি।

এভাবে চলতে চলতে শেষ সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ঈমান ও আক্বীদায় মুসলিম বিশ্ব অধঃপতনে নিমজ্জিত। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বাগডোর চলে গেছে এমন এক প্রজন্মের হাতে যারা ইসলামের আক্বীদা ও মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখে না, ইসলামী মূল্যবোধের জন্য আলোড়িত হয় না, রাজনৈতিক স্বার্থ বা 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' ব্যতিরেকে নির্দোষ ঈমানদীপ্ত মুসলিম জনতার সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

মুসলিম বিশ্বের দরকার এমন কিছু ইলমি সংস্থার– যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হবে নতুন শক্তিশালী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করা, যে সাহিত্য আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজকে সঠিক পূর্ণাঙ্গ অর্থে ইসলামের দিকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনবে, তাদেরকে মুক্ত করবে সেসব পাশ্চাত্য দর্শনের শৃঙ্খল থেকে– যা জেনে-শুনে মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই। আর অধিকাংশ যুবসমাজ বিশ্বাস করে এসব দর্শনকে শুধু অনুকরণ নির্ভর হয়ে। এমন সাহিত্য তৈরি করতে হবে যা তাদের বিবেকে নতুন করে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে এবং যা তাদের হৃদয় ও মন-মানসকে পরিপুষ্ট করবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণায় কোণায় এমন কিছু লোকের প্রয়োজন যারা শুধু এই জিহাদ ও সংগ্রাম নিয়েই কাজ করে যাবে নিমগ্নচিত্তে।"

সকল প্রশংসার মালিক মহান রাব্বুল আলামীন।

সমাপ্ত